সাংবাদিকের চোখে
পার্বত্য চট্টগ্রাম ও
'শান্তিবাহিনী'
আলীমুজ্জামান হারুন

# সাংবাদিকের চোখে
# পার্বত্য চট্টগ্রাম ও শান্তিবাহিনী

আলীমুজ্জামান হারুন

# আত্মপক্ষ

পার্বত্য চট্টগ্রাম বাংলাদেশের সবুজ শ্যামল নিসর্গে যেন এক জ্বলন্ত অগ্নিকুন্ড। বিস্তীর্ণ পাহাড় ও উদার প্রকৃতির অবারিত হাতছানি দেয়া ঐ অঞ্চলটি আজ মানুষের সংকীর্ণতা, হিংস্রতা ও যুক্তিহীন প্রতিহিংসাপরায়ণতায় বার বার রক্তাক্ত হচ্ছে। পাহাড়-জঙ্গলের বন্য প্রাণী নয়, পাহাড়ের অন্ধকার থেকে নেমে আসা মানুষই হায়েনার মতো থাবা বসাচ্ছে অপর মানুষের শান্তির নীড়ে। কোন যুক্তি এখানে কার্যকর হচ্ছে না, শান্তির ললিত বাণী যেন ব্যর্থ পরিহাস।

এই যখন পরিস্থিতি, তখন গত ২ মে থেকে ৯ মে মোট ৮ দিন পার্বত্য অঞ্চলের বিস্তীর্ণ এলাকা সফর করি। পার্বত্য চট্টগ্রামকে ঘিরে জনমনে যে সংশয়, যে দ্বিধাদ্বন্দ্ব, সমস্যার স্বরূপ ও সমাধানের সরকারী সদিচ্ছা ও প্রচেষ্টা নিয়ে বিদ্যমান যে কোন ধরনের সন্দেহ অপনোদন স্পষ্টতঃই এ সফরের উদ্দেশ্য ছিল।

পার্বত্য চট্টগ্রামের মতো একটি বিশাল এলাকাকে জানা, তার উপজাতি-অধিবাসীদের সমস্যা ও ক্ষোভকে উপলব্ধি করা, সর্বোপরি সরকারের ব্যাপক উন্নয়ন কর্মকান্ডকে সরেজমিনে প্রত্যক্ষ করার জন্য সফরের দিনগুলো ছিল আক্ষরিক অর্থেই সীমাবদ্ধ।

কিন্তু আমি মনে করি, পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতি অ-উপজাতি সহজ সরল মানুষগুলো আমাদেরই আত্মার অংশ, স্বজন ও ভাই। ছোট ও দরিদ্র এ ভূখন্ডে আমরা পরস্পর জড়াজড়ি করে থাকি বলে তাদের হৃদয়ের ভাষা, আত্মার আকুতি মনের চোখ দিয়ে দেখতে চাইলে, হৃদয়ের কান পেতে শুনতে চাইলে, সত্তার মমতা দিয়ে অনুভব করতে চাইলে সময় সেখানে প্রধান প্রতিবন্ধক হতে পারে না।

একজন পেশাজীবী সাংবাদিক হিসেবে আমাকে নির্মোহ হতে হয়। তবে একজন সাংবাদিক একই সাথে একজন মানুষও বটে। কাজেই, যখনই চেষ্টা করেছি পাহাড়ী চট্টলার উচুঁ নীচু পাহাড়ে ও সবুজ অরণ্যঘেরা প্রকৃতির ভেতরের ক্ষোভ ও আগুনকে উপলব্ধি করতে তখন আমি আমার সাংবাদিক চোখটিকেই শুধু খোলা রাখিনি, আমার মানবিক দৃষ্টিকোণটিও সমান তৎপর ছিল। এর অর্থ এই নয় যে, আমি কোন বিশেষ পক্ষের প্রতি দুর্বলতায় আকীর্ণ ছিলাম। বরং আমি সব সময় চেষ্টা করেছি প্রকৃত সত্য উদঘাটনের। ঢাকা ফিরে এসে আমার কর্মস্থল দৈনিক দিনকাল-এ প্রকাশিত ধারাবাহিক প্রতিবেদনগুলোতে আমার সে প্রচেষ্টার কোনো ঘাটতি ছিল না। আমি চেয়েছি, প্রিয় পাঠককেও আমার অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধির অংশীদারিত্ব দিতে। আমার সে প্রচেষ্টার কোথাও যদি কোন ক্রুটি থেকে থাকে, যদি থেকে থাকে কোনো পক্ষপাতিত্বের ন্যূনতম ছাপ, তাহলে সেটা একান্তই আমার অনিচ্ছাকৃত।

প্রতিবেদনটি দৈনিক দিনকাল-এ ধারাবাহিকভাবে প্রকাশের সময়ই আমার অফিসের সহকর্মী বন্ধুরা এবং অফিসের বাইরের অনেক শুভাকাঙ্খী এটিকে একটি বই আকারে রূপ দেয়ার কথা বলেন। বিশেষ করে দৈনিক দিনকালের ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক সৈয়দ জাফর, বার্তা সম্পাদক আলী আকবর, চীফ সাব এডিটর আবু সাঈদ জুবেরী ও নাসিমুন্নাহার নিনি'র কাছে আমি ঋণী।

তাঁরা দিনকালের পাতায় প্রতিবেদনগুলো গুরুত্ব সহকারে আন্তরিকতার সাথে ফলাও করে প্রকাশে সহায়তা করে আমাকে উৎসাহিত করেছেন। এক পর্যায়ে শ্রদ্ধাভাজনেষু সৈয়দ জাফর প্রতিবেদনগুলোকে গ্রন্থরূপ দিতে উৎসাহ যোগান। তাছাড়া, বন্ধু আলী মামুদ, সৈকত রুশদী, সালেম সুলেরী আমাকে যুগিয়েছেন যথেষ্ট উৎসাহ। তাদের এ মতামতের প্রেক্ষিতে আমি নিজেও মনে করতে থাকি যে, আজ হোক, কাল হোক, পার্বত্য চট্টগ্রামের নিরূপদ্রব নিসর্গ থেকে একদিন না একদিন সন্ত্রাসী তৎপরতার মূলোৎপাটন হবেই। বন্ধ হবেই নিরপরাধ মানুষের অন্যায় রক্তপাত ও মর্মান্তিক আহাজারি। কিন্তু আজ যারা প্রাণ দিল, রক্ত দিল, অন্যায়ভাবে যাদের বাধ্য করা হল পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে, যারা ভিটেমাটি ছাড়া হলো, পঙ্গু হলো– তাদের এ নীরব আত্মত্যাগ কি সময়ের গহ্বরে বিলীন হয়ে যাবে? স্বজনহারা মানুষের আর্তনাদ কি ধরার ধুলোয় হবে হারা? পৃথিবীর কোথাও কি মাত্র কয়েকটি পৃষ্ঠায়ও ধরে রাখা যায় না এদের কথাগুলো? – এ বোধ থেকেই আমি প্রতিবেদনগুলোকে গ্রন্থবদ্ধ করার তাড়না অনুভব করতে থাকি।

গ্রন্থাকারে রূপ দেবার সময় প্রতিবেদনগুলোকে আমি প্রতিবেদন আকারেই রেখে দিয়েছি, নিবন্ধ করে তোলার চেষ্টা করিনি। করিনি পাঠক একটি বই হাতে নিয়ে পত্রিকার প্রতিবেদন পড়ায় অন্যরকম স্বাদ পাবেন– এই ভেবে।

পাঠকদের বিন্দুমাত্র জানার তৃষ্ণাও যদি এ' গ্রন্থ পাঠে মেটে, আমার জন্যে সেটাই হবে সবচাইতে বড় পাওনা।

এ বই প্রকাশে যারা অনুপ্রেরণা যুগিয়েছেন, উৎসাহ দিয়েছেন, করেছেন নানারকম সাহায্য-সহযোগিতা, তাদের সবার প্রতি আমি বিনম্রচিত্তে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি।

আলীমুজ্জামান হারুন
দৈনিক দিনকাল
২২ তোপখানা রোড
ঢাকা–১০০০

# কেন এ উপস্থাপনা

অনেক ত্যাগ তিতিক্ষা ও প্রাণ বিসর্জনের মধ্য দিয়ে দেশে আজ বইছে গণতন্ত্রের সুবাতাস। প্রতিষ্ঠিত হয়েছে মানুষের মৌলিক অধিকার ও বিভিন্ন মত প্রকাশের স্বাধীনতা। এক সাগর রক্তের বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীনতাকে বিপন্ন করার ষড়যন্ত্র সেই স্বাধীনতার সূচনালগ্ন থেকেই। ষড়যন্ত্রকারীরা যখনই সুযোগ পায়, দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব নিয়ে ষড়যন্ত্রে মেতে উঠে। এ ষড়যন্ত্রের মধ্য দিয়েই হাঁটি হাঁটি পা পা করে অতিক্রান্ত হয়েছে ২০টি বছর। বাংলাদেশের মাটি আজ দেশপ্রেমিক জাতীয়তাবাদী শক্তির ঘাঁটি। কিন্তু তবুও ষড়যন্ত্র থেমে নেই। গণতন্ত্রের সুযোগ নিয়ে ষড়যন্ত্রকারীরা দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব নিয়ে ষড়যন্ত্রে আবার লিপ্ত হয়েছে। দীর্ঘদিন পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্ত থাকার পর হঠাৎ করে আবার উত্তপ্ত করা হয়েছে। দেশ যখন গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে ধীরে ধীরে উন্নয়নের দিকে এগিয়ে চলেছে ঠিক তখনই তথাকথিত শান্তিবাহিনী পার্বত্য চট্টগ্রামের নিরীহ বাংলা ভাষাভাষী মুসলমানকে নির্বিচারে পাখির মত গুলী করে হত্যা করছে। এর পেছনেও রয়েছে এক গভীর ষড়যন্ত্র।

ভাবতেও অবাক লাগে, গত ১০ এপ্রিল পার্বত্য চট্টগ্রামের খাগড়াছড়ি জেলার পানছড়ি উপজেলার লোগং-এ তথাকথিত শান্তিবাহিনী মুসলমান অ-উপজাতিদের হত্যাকে কেন্দ্র করে ঘটে যাওয়া এক দুঃখজনক ঘটনার পর দেশী-বিদেশী বিভিন্ন স্থান থেকে এ ঘটনার তীব্র নিন্দা করে বক্তব্য বিবৃতি প্রদান করা হয়। ১৩ জন নিহত হবার পরিসংখ্যানকে ১৩শ' করে বিশ্বে প্রচার করা হয়। বিশ্বের বিভিন্ন মানবাধিকার সংগঠন পার্বত্য চট্টগ্রামে মানবাধিকার লংঘনের অভিযোগ উত্থাপন করে। অথচ দুঃখজনক হলেও সত্য, লোগং ঘটনার মিথ্যা তথ্যের উপর ভিত্তি করে বিদেশের কয়েকটি প্রচার মাধ্যম ও মানবাধিকার সংস্থা যে আগ্রহভরে মানবাধিকার লংঘনের অভিযোগ তুলে তৎপরতা দেখালেন তা সকলকে বিস্মিত করেছে কিন্তু তারপর এ পর্যন্ত ৩১ জন বাংলা ভাষাভাষী মুসলমান অ-উপজাতিকে তথাকথিত শান্তিবাহিনী নির্মমভাবে গুলী করে হত্যা করলো সে ব্যাপারে একটি কথাও উচ্চারণ করা হলো না। তাদের কণ্ঠে উচ্চারিত হলো না এসব হতভাগ্য মুসলমানের কি অপরাধ। তারা তো নিরীহ ও নিরস্ত্র এবং এদেশেরই সন্তান। বাস করছে দেশের ভৌগোলিক সীমারেখার মধ্যেই। তবুও কেন তারা এ নৃশংসতার শিকার? প্রকৃত পক্ষে সব কিছুই একটি ষড়যন্ত্রের নীল নকশা অনুযায়ী পরিচালিত। লোগং ঘটনার ২৪ ঘন্টার মধ্যে ঘটনাকে অতিরঞ্জিত করে দাতাদেশগুলোর কাছে মিথ্যা খবর পৌছে দেয়া, প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার ভারত সফরের আগে হত্যাযজ্ঞ চালানো, রাঙ্গামাটিতে উপজাতীয় দ্বারা অ-উপজাতি মুসলমানদের উপর হামলা সব কিছুই একই যোগসূত্রে গাঁথা।

গণতান্ত্রিক অধিকারের মোড়কে পার্বত্য চট্টগ্রামে নতুন করে আত্মপ্রকাশ করেছে বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ, পার্বত্য চট্টগ্রাম গণ-পরিষদ এবং পাহাড়ী পেশাজীবী সংস্থা নামে বিভিন্ন উপজাতীয় সংগঠন। এ সব সংগঠন সাংবাদিক সম্মেলন, সভা ও বিবৃতির মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসরত উপজাতীয় জনগোষ্ঠী ও প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে

অতিরঞ্জিত ও ভুল তথ্য এবং উদ্দেশ্যপ্রণোদিত যে অভিযোগ তুলে ধরছে তা সত্যিকার বিবেকবান মানুষকে বিস্মিত করে দেয়।

স্বাধীনতা পরবর্তী গত বিশ বছরে পার্বত্য চট্টগ্রামে সরকারের গৃহীত বিভিন্ন অর্থনৈতিক, সমা জিক ও রাজনৈতিক উন্নয়নের চুলচেরা বিশ্লেষণ করা না গেলে প্রকৃত অবস্থা অনুধাবন করা সম্ভব নয়। পার্বত্য চট্টগ্রামের সংখ্যালঘু উপজাতীয় জনগোষ্ঠীর জন্য সরকারের গৃহীত কার্যক্রম এক যুগান্তকারী পদক্ষেপ। স্থানীয় সরকার পরিষদ গঠন, দেড় হাজার কোটি টাকা উন্নয়নের জন্য ব্যয়, শিক্ষা, চাকরিতে বিশেষ কোটা সংরক্ষণ এসবই পদক্ষেপের উল্লেখযোগ্য দিক। তারপরও সরকারের প্রতিটি ইতিবাচক পদক্ষেপের বিরোধিতা করে উপজাতীয়দের· একটি স্বার্থান্বেষী বিশেষ শ্রেণীর অংশ চরম অকৃতজ্ঞতার পরিচয় দিয়ে সশস্ত্র আন্দোলনের নামে একের পর এক সন্ত্রাসী কর্মকান্ড চালিয়ে যাচ্ছে। হত্যা করছে মুসলমান বাংলা ভাষাভাষীকে। অপপ্রচার চালাচ্ছে পার্বত্য চট্টগ্রাম সম্পর্কে, ষড়যন্ত্র করছে দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের বিরুদ্ধে। প্রতিবেশী দেশের সংবাদপত্রে উপজাতীয়দের পক্ষে সাফাই গেয়ে প্রচার করা হয় যখন মিথ্যা সংবাদ তখন প্রচার হয় না উপজাতীয় তথাকথিত শান্তিবাহিনী নির্বিচারে পাখির মত গুলী করে হত্যা করছে মুসলমান বাংলা ভাষাভাষী অ-উপজাতিকে। এটাই আজ প্রশ্নঃ গত ১২ বছরে ২ হাজারের উপর মুসলমানকে হত্যা করা হয়েছে পার্বত্য চট্টগ্রামে। পক্ষান্তরে উপজাতীয়দের প্রাণহানি দেড়শ'ও ছাড়িয়ে যায়নি। অথচ ঢাকার এক শ্রেণীর বুদ্ধিজীবী ও মিশনারীরা প্রচার করছে শান্তিবাহিনীর কোন অপরাধ নেই।

পার্বত্য নাগরিক কমিটি শান্তিবাহিনীর নৃশংসতা থেকে অসহায় পার্বত্যবাসীকে বাঁচাবার জন্য এগিয়ে আসার আহবান জানিয়ে এক প্রচারপত্রে বলেছেঃ অভাবের সংসারে হানা দিয়ে শান্তিবাহিনী অস্ত্রের ভয় দেখিয়ে তুলছে চাঁদা। চাঁদা দিতে অস্বীকার করলে মৃত্যু নির্ঘাত। তারা জোর করে চাঁদা তুলে নিয়ে বিদেশের মাটিতে বিলাসী জীবন যাপন করছে। নির্মম নির্দয়ভাবে হত্যা করছে নিরপরাধ শিশু-বৃদ্ধ। খুন, অপহরণ, উৎপীড়নে তারা পার্বত্য ভূমিকে মানবতার বধ্যভূমিতে পরিণত করেছে।

নিপীড়িত পার্বত্য নাগরিকদের আরো অভিযোগ, "ভারতের ইঙ্গিতে পরিচালিত সন্ত্রাসীদের এ হত্যাযজ্ঞের বিরুদ্ধে বাংলাদেশের সচেতন মহল, বুদ্ধিজীবী, মানবাধিকার কর্মী প্রতিবাদ করছে না। বরং রহস্যজনক কৌশলে কতিপয় সুবিধাভোগী উপজাতীয় ছাত্রের কপট প্রচারে বিভ্রান্ত হয়ে একপেশে বিবৃতি দিয়ে কিছু বুদ্ধিজীবী পরিস্থিতিকে করছে আরো জটিল।"

পার্বত্য চট্টগ্রামে যখন গত ১৭ বছর ধরে নির্বিচারে মুসলমানকে হত্যা করা হচ্ছে, তখন আমাদের দেশের একশ্রেণীর বুদ্ধিজীবীরা একবারও উপজাতীয় জনগোষ্ঠীর উপর আধিপত্যকামী এবং মুসলিম প্রধান দেশে মুসলমানকে হত্যাকারী চাকমা শান্তিবাহিনীকে একটিবারও ভর্ৎসনা করছেন না। বরং চাকমা প্রসঙ্গে নিবন্ধ রচনা করে বিভিন্ন খোঁড়া যুক্তি দাঁড় করাচ্ছেন। চাকমা শান্তিবাহিনী কতটা সাম্প্রদায়িক তার প্রমাণ দিচ্ছে অসহায় দরিদ্র মুসলমানকে খুন করে ও পুড়িয়ে হত্যার মাধ্যমে। অথচ পার্বত্য অঞ্চলে উপজাতি ও অ-উপজাতি মুসলমানরা শত শত বছর ধরে পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাস করে আসছে। প্রতিবেশী দেশ

শান্তিবাহিনীকে আশ্রয় ও ট্রেনিং দিয়ে হত্যাযজ্ঞে নামানোর আগ পর্যন্ত পার্বত্য চট্টগ্রামে কোন সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্প ছিল না। গত ৩শ' বছরে একজন উপজাতিকেও জোর করে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করা হয়নি। কিন্তু খৃষ্ট ধর্মে ধর্মান্তরের ঘটনা ঘটেছে শত শত। তাতে চাকমা শান্তিবাহিনীর কোন আপত্তি নেই। আপত্তি নেই ঢাকার এক শ্রেণীর বুদ্ধিজীবীদের। অথচ পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ অনর্গল বলে যাচ্ছে পার্বত্য অঞ্চলে উপজাতিকে জোর করে মুসলমান করা হচ্ছে। যা সত্যের অপলাপ মাত্র। চাকমা শান্তিবাহিনীর সদস্যরা যখন আপন অঞ্চলে ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়ে করছে বিরান, তখন সরকার তাদের দিচ্ছে উন্নয়ন। দিচ্ছে বৃত্তিসহ নানাবিধ সুযোগ সুবিধা। কিন্তু এ মানবতার জবাব দিচ্ছে তারা মুসলমান অ-উপজাতিকে হত্যা করে। অথচ সরকার, নিরাপত্তা বাহিনী পাল্টা পদক্ষেপ গ্রহণ না করে চালিয়ে যাচ্ছে শান্তকরণ কর্মসূচী। এটাকে তারা দুর্বলতা হিসাবে গ্রহণ করে হত্যাযজ্ঞ চালাতে আরো উৎসাহিত হচ্ছে। পার্বত্য অঞ্চলে আর কত রক্ত দিবে বাংলা ভাষাভাষী মুসলমান। সময় এসেছে- সরকার, রাজনৈতিক শক্তি ও নিরাপত্তা বাহিনী শান্তি প্রতিষ্ঠায় কঠোর পদক্ষেপ নিলে দেশের বিপুল জনগোষ্ঠীর মতামতেরই প্রতিফলন ঘটবে। সম্প্রতি খাগড়াছড়ি সফরকালে প্রধানমন্ত্রী গণতন্ত্রের আপোসহীন নেত্রী সংসদ নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া বলেছেনঃ কেবল মাত্র দেশের সংবিধান ও সাংবিধানিক কাঠামোর মাধ্যমেই পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা সমাধান সম্ভব। একথা শুধু প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ারই নয়। দেশের ১১ কোটি মানুষের কথা।
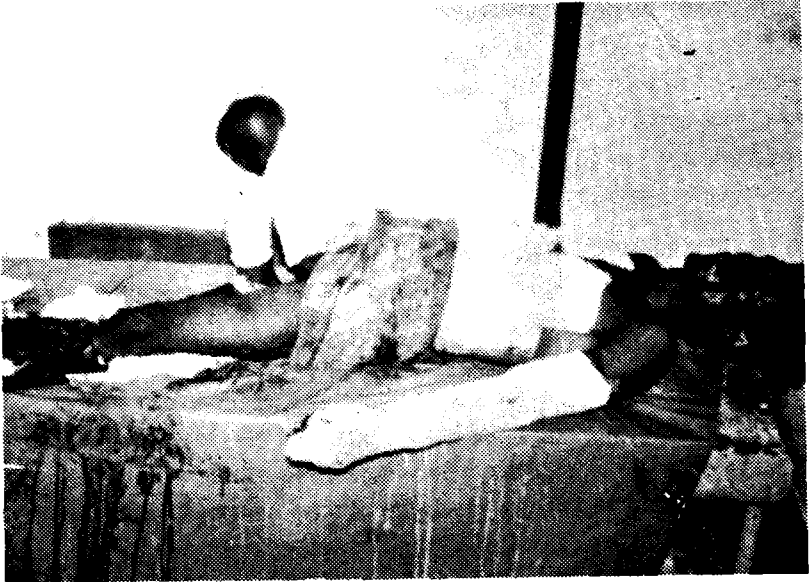
*শান্তিবাহিনীর গুলীতে আহত এক বাংলা ভাষাভাষী অ-উপজাতি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন*

## পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ শান্তিবাহিনীর বি–টিম

# লোগং ঘটনা ছিলো শান্তিবাহিনীর সুপরিকল্পিত ষড়যন্ত্র

লোগং–এ উপজাতি ও অ–উপজাতির মধ্যে গত ১০ এপ্রিলের দুঃখজনক ঘটনাটি ছিল পূর্ব পরিকল্পিত। শান্তিবাহিনীর বি–টিম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের সুদূর প্রসারী পরিকল্পনা ও ষড়যন্ত্রের হীন ফসল। লোগং–এ হত্যাকান্ড ঘটালো, পরের দিন ঢাকা থেকে বীযু উৎসবে ২৬ সদস্যের একটি রাজনীতিবিদ, শিক্ষক–ছাত্র, বুদ্ধিজীবী ও সাংবাদিক প্রতিনিধি দলের যোগদান এবং ঢাকায় এসে পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের পক্ষে বিবৃতি সব কিছুই ছিল ষড়যন্ত্রের অংশ বিশেষ। হয়তো প্রতিনিধি দলের কেউ কেউ এ ষড়যন্ত্রের রহস্য আগে ভাগে জানতে পারেনি। কিন্তু ষড়যন্ত্রের জালে পা দিয়ে ঢাকায় এসে যে বিবৃতি বক্তব্য প্রদান করেছেন, তাতে তাঁরা কতটুকু বিচক্ষণতার পরিচয় দিতে পেরেছেন, তা আজ প্রশ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে।

লোগং খাগড়াছড়ি জেলার পানছড়ি উপজেলাধীন একটি ইউনিয়ন। মাত্র ৪ কিলোমিটার দূরে ভারতের ত্রিপুরা সীমান্ত। লোগং নদীর পাড়ে এ ইউনিয়নের অবস্থান। শান্তিবাহিনীর হামলা থেকে নিরাপত্তা বিধান কর্মসূচীর আওতায় উপজাতি ও অ–উপজাতীয়দের জন্য রয়েছে বিডিআর ক্যাম্প। তাদের নিরাপত্তা বেষ্টনীর মধ্যে রয়েছে পাশাপাশি তিনটি বসতি। চাকমা উপজাতীয়দের জন্য শান্তিগ্রাম, ত্রিপুরা উপজাতীয়দের জন্য বড়পাড়া, ও অ–উপজাতীয়দের (পাহাড়ী নয়) জন্য রয়েছে গুচ্ছগ্রাম। এ গ্রাম পাহারা দেয়ার জন্য রয়েছে আনসার ও ভিডিপি সদস্য। শান্তি গ্রামের লোকসংখ্যা ২২৩৬ জন। মোট পরিবার ৫৪৬টি এবং মোট ঘর ৬৪২টি। বড়গ্রামের লোকসংখ্যা ১০০৫ জন, মোট পরিবার ২২৮টি, মোট ঘর ২২৮টি। গুচ্ছগ্রামের লোক সংখ্যা ৭৩২ জন, মোট পরিবার ২৭৪টি এবং ঘর ৫২৪টি।

ঘটনার দিন, বেলা সাড়ে ১০ টা। গুচ্ছগ্রামের নিরাপত্তা এলাকার বাইরে এ গ্রামেরই ৪ জন বালক গরু চরানোর জন্য পার্শ্ববর্তী বড়পাড়া এলাকায় যায়। দীর্ঘক্ষণ গরু চরানোর পর শান্তি গ্রামের পাশ দিয়ে আসার পথে শান্তিবাহিনীর একদল সদস্য কোন কারণ ছাড়া বালকদের কোপাতে শুরু করে। এতে কবির আহমদ (১১) পিতা মনা মিয়া ঘটনাস্থলেই মারা যায়। অপর ২ জনকে কুপিয়ে গুরুতরভাবে আহত করে। তারা মাটিতে লুটিয়ে কাতরাতে থাকে। চতুর্থ বালক ঝোপের আড়ালে লুকাতে সক্ষম হয় এবং প্রাণে বেঁচে যায়। শান্তিবাহিনী শান্তি গ্রামের দিকে চলে গেলে বালকটি গুচ্ছগ্রামের মসজিদে গিয়ে উপস্থিত মুসল্লীদের খবর দেয়। সেদিন ছিল শুক্রবার। ইমাম সাহেব মাত্র খুতবা শুরু করেছেন। এ সময় বালকটির কাছ থেকে শান্তিবাহিনীর হামলার খবর শুনে উপস্থিত বাঙালী ও ভিডিপির সশস্ত্র সদস্যরা উত্তেজিত হয়ে বড়পাড়ায় গিয়ে আহত বালক ২টিকে উদ্ধার করে এবং নিহতের লাশ নিয়ে চলে আসতে থাকে। এ সময় বড়পাড়া থেকে বাঙালীদের উপর গুলী ছোড়া হয়। এতে বাঙালীরা আরো

উত্তেজিত হয়ে শান্তিগ্রাম ও বড়পাড়ায় দুই দলে বিভক্ত হয়ে হামলা চালায়। তারা ছনের ঘরে আগুন দিলে প্রচন্ড খরা ও বাতাসে আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। এ সময় নিরাপত্তা বিধানকারী বিডিআর-এর একটি দল ঘটনাস্থলে গেলে তাদের উপর নিকটবর্তী একটি পাহাড়ের আড়াল থেকে গুলী চালানো হয়। বিডিআরও পাল্টা গুলী চালায় এবং ভিডিপি সদস্যরাও গুচ্ছগ্রামে গুলী চালায়। ফলে এ সময় শান্তিগ্রামের ১১জন নিহত ও ৯ জন আহত হয় এবং ৫৮৭টি ঘর ভস্মীভূত ও ৫৪৬টি পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বড় পাড়ার ১ জন নিহত ও ১ জন আহত, ১৮টি ঘর ভস্মীভূত ও ১৪টি পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হয়। গুচ্ছগ্রামের ১ জন নিহত, ৩ জন আহত ও ৪টি পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হয়। মোট ১৩ জন নিহত, ১৩ জন আহত ও ৬০৫টি ঘর ভস্মীভূত এবং ৫৬৪টি পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

নিহত ব্যক্তিরা হচ্ছেঃ খগেন্দ্র ত্রিপুরা (৫৫) পিতাঃ নিশি চন্দ্র ত্রিপুরা; টনা চাকমা (৮) পিতাঃ অমীয় কান্তি চাকমা; কিরণ বিকাশ চাকমা (১৩) পিতা রাজেন্দ্র চাকমা; চক্ষু চাকমা (২২) পিতা রাজেন্দ্র চাকমা; হবিদশ চাকমা (৫৫) পিতাঃ মৃত চক্রধন চাকমা; বুধি চাকমা (১৫) পিতাঃ মৃত খোলারাম চাকমা; কালিকুমার চাকমা ((৬০) পিতাঃ পঞ্চকা চাকমা; মলিকা দেবী চাকমা (২৮) স্বামীঃ বসন্তমনি চাকমা; সদোবধি চাকমা (৫৫) স্বামীঃ গোলক চাকমা; কালাবী চাকমা (৪০) স্বামীঃ রাজচন্দ্র চাকমা; মংলা চাকমা (২৬) পিতাঃ তংলা চাকমা; স্নেহ দেবী চাকমা (৮) পিতাঃ বিমলেন্দু চাকমা; কবির আহমদ (১১) পিতাঃ মোঃ মনা মিয়া।

আহত ব্যক্তিরা হচ্ছেনঃ মোহাম্মদ আবুল কাশেম (১৪) মোহাম্মদ আবদুল করিম (১১) মোহাম্মদ জসিম উদ্দিন (১০) কুমরী চাকমা (৪৮), রূপসেন চাকমা (৪৫), প্রিয় বাংলা চাকমা (২০), প্যারী মোহন চামকা(৩৫), অমর সাধন চাকমা (১), দানক্ষী চাকমা (৬০), অমলা চাকমা (৪০), খরি চৌকি চাকমা (৩৫) ও হেরেন্দ্র ত্রিপুরা (৪০)।

গত ৫মে দিনকালের এই প্রতিনিধি লোগং যান এবং এলাকার বিভিন্ন পর্যায়ের লোকের সাথে কথা বলেন। কথা বলেন, ক্ষতিগ্রস্ত গুচ্ছগ্রামের বাঙালীদের সাথে, শান্তিগ্রামের চাকমাদের সাথে। এছাড়া সেনাবাহিনীর লোগং জোন কমান্ডার কর্ণেল মতিনের সঙ্গে। ঢাকায় বসে লোগং-এর ঘটনা যেভাবে শুনেছি, বাস্তবে তার কোন মিল পাইনি। স্থানীয় সংসদ সদস্য বাবু কল্পরঞ্জন চাকমা সংসদে যে বিবৃতি দিয়েছিল, তা ছিল অতিরঞ্জিত। একইভাবে পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের বক্তব্য ও ঢাকা থেকে বীযু উৎসবে যোগদানকারীরা ফিরে এসে যে বিবৃতি দিয়েছেন তাও ছিল বাস্তবতা বিবর্জিত। প্রকৃত পক্ষে ঘটনাটিকে ভিন্নভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। একটি মহল ঘটনাটি অতিরঞ্জিত করে নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধির চেষ্টা করেছে। পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ এ ঘটনায় শত শত নিহত হয়েছে বলে দাবী করেছে।

জোন কমান্ডার কর্ণেল আবদুল মতিন জানান, ঘটনার পর শান্তিগ্রামের কিছু লোক মামলা দায়ের করতে চায় না, পানছড়ি থেকে মামলা নেয়ার জন্য স্বয়ং ওসি লোগং-এ এসে দুই দিন অপেক্ষা করলেও কেউ মামলা করেনি। মামলা করলেই নিহতদের প্রকৃত সংখ্যা উদঘাটিত হবে এ আশংকায় তারা মামলা করেনি বলে জনাব মতিন জানান। ঘটনার পর পরই খাগড়াছড়ি ব্রিগেড কমান্ডার ব্রিগেডিয়ার শরীফ আজিজসহ স্থানীয় প্রশাসন লোগং-এ আসে এবং শান্তি

শৃঙ্খলার ব্যবস্থা নিশ্চিত করে। ১৯ এপ্রিল চট্টগ্রামের জিওসি মেজর জেনারেল মাহমুদুল হাসান লোগাং পরিদর্শন করেন। ২৫ এপ্রিল স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আবদুল মতিন চৌধুরী লোগাং ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা স্ব-চক্ষে দেখেন এবং স্থানীয় পাহাড়ী বাঙালীদের কথা শুনেন। এছাড়া সংসদের বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা এলাকা পরিদর্শন করেছেন বলে জোন কমান্ডার জানান। স্থানীয় সংসদ সদস্য বাবু কল্পরঞ্জন চাকমা ঘটনার বেশ কিছুদিন পর লোগাং-এ গেলে সংসদে তার বিবৃতি প্রসঙ্গে স্থানীয় গণ্য-মান্য ব্যক্তিবর্গ জানতে চাইলে তিনি অতিরঞ্জিত বক্তব্যের জন্য দুঃখ প্রকাশ ও ভুল স্বীকার করেন এবং বলেন, এসব তথ্য এলাকাবাসী জানায়। ঘটনার পর বড়পাড়ার ও শান্তিগ্রামের বহু উপজাতি পরিবার পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন উপ-জাতীয় গ্রামে আশ্রয় নেয়। এর মধ্যে সূর্যমহল পাড়ায় ১৪০টি, কারবারী পাড়ায় ৭৮টি, রূপসা মেম্বার পাড়ায় ২৩টি, চিকন চান্দ্র কারবারী পাড়ায় ১৭টি ও সীমানা পাড়ায় ২৩টি পরিবার আশ্রয় নিয়েছে। ঘটনার পরের দিন মামলা করার জন্য কোন লোক পাওয়া না গেলে মাইকিং করা হয়। কেউ মামলা দায়ের করতে এগিয়ে আসেনি। জোন কমান্ডার জানান, নিহত ব্যক্তিদের স্বজনদের কাছে ৫ হাজার এবং আহতদের ২ হাজার করে নগদ অর্থ স্থানীয় সরকার পরিষদ থেকে দেয়া হয়েছে। এছাড়া ছাত্রদের ১ হাজার টাকা করে মোট ৫৩ হাজার টাকা বিতরণ করা হয়েছে। সেনাবাহিনীর এরিয়া ও খাগড়াছড়ি রিজিয়ন জোন থেকে ২ লাখ ৫৯ হাজার ৩৭৫ টাকা বিতরণ করা হয়েছে। এর মধ্যে নগদ বিতরণ ১,৫৭,৯০০ টাকা, গৃহ নির্মাণ ৬৭,৪২৫ টাকা, রান্নার সরঞ্জাম বাবদ ১৫ হাজার ৫০ টাকা ও পরীক্ষার্থী ছাত্রদের মধ্যে ১৯ হাজার টাকা বিতরণ করা হয়েছে।। অর্থাৎ সর্বমোট ৪ লাখ ৩ হাজার ৩৭৫ টাকা লোগাং ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্তদের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে।

শান্তিবাহিনীর পক্ষের শক্তি পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ ও পাহাড়ী গণ-পরিষদ তাদের এক প্রচারপত্রে দাবী করেছে, ঘটনার দিন লোগাং গুচ্ছগ্রাম থেকে তিনজন পাহাড়ী যুবতী মাঠে গরু চরাতে গেলে পার্শ্ববর্তী বাঙালী গুচ্ছগ্রাম থেকে কিছু উচ্ছৃংখল যুবক জোরপূর্বক তাদের ধর্ষণের চেষ্টা করে। যুবতীরা আত্মরক্ষার্থে দাও দিয়ে কোপ দেয়, এতে একজন মারা যায়। যা সত্যের অপলাপ মাত্র। ১১ বছরের কোন বালক ৪ জন যুবতী মেয়েকে ধর্ষণ করতে চাইলে তা কোন যুক্তিতেই বিশ্বাসযোগ্য করে তোলা যায় না। প্রকৃত পক্ষে পুরো ঘটনাটি ছিল সম্পূর্ণ সুপরিকল্পিত। এই প্রতিনিধি শান্তিগ্রামে গিয়ে নতুন কয়েকটি ঘর দেখলেও কোন লোকজন দেখেনি। একটু দূরে বড়পাড়ার লোক দেখা যায়। ১৬/১৭ বছরের এক ত্রিপুরা যুবকের সাথে কথা বললে সে জানায়, গুচ্ছগ্রামের লোকেরা গরু চরানোর সময় শান্তিবাহিনী হামলা করে। এতে একজন নিহত ও ২ জন আহত হয়। স্থানীয় প্রশাসন ও সেনাবাহিনীর সদস্যরা তাদেরকে নগদ অর্থ দিয়ে সাহায্য করেছে বলে সে জানায়। এক প্রশ্নের জবাবে সে বলে পাহাড়ের খালের মত (পাহাড়ীরা যাকে ছড়া বলে) দিয়ে শান্তিবাহিনী এখানে আসে। সামান্য কিছু সময় থেকে পুনরায় পাহাড়ে চলে যায়।

শান্তিগ্রামের বাসিন্দা বর্তমানে অন্যত্র চলে গেছে এ ধরনের বেশ কয়েকজন চাকমার সাথে যোগাযোগ করা হয়েছে। নারায়ণ চাকমা জানায়, ঘটনার দিন দুপুরে আনসার ও ভিডিপি তাদেরকে গুলী করে। সে ১৪টি লাশ দেখেছে বলে জানায়। এক প্রশ্নের জবাবে সে জানায়,

সে এখানে আর বসবাস করবে না। আনন্দ মনির (৫৫) জানায়, বিডিআর গুলী করেছে। তার বাবা হরিদাস মারা গেছে। অময় কান্তি (৪০) জানায়, তার মেয়ে তনা চাকমা (২) মারা গেছে। তারা সরকারী সাহায্য পেয়েছে বলে জানায়।

সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান জগদীশ চন্দ্র চাকমা জানায়, ১১টি লাশ পাওয়া গেছে। তিনি বাদী হয়ে মামলা করেছেন ঘটনার কয়েকদিন পরে। এ ব্যাপারে ৮ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। স্থানীয় পর্যায়ে ২টি তদন্ত টিম গঠন করা হয়েছে।

এছাড়া লোগাং বাজারের দোকানীসহ বিভিন্ন স্তরের লোকজনের সাথে এ প্রতিনিধি আলাপ করে প্রকৃত ঘটনা বোঝার চেষ্টা করেছে। লোগাং-এর ঘটনা একটি সুদূর প্রসারী পরিকল্পনার অংশ বিশেষ বলেই এখানকার বাংগালীরা মনে করে। পরিকল্পনা ছিল ঢাকা থেকে বিশেষ অতিথি দলটিকে যে কোন একটি লোমহর্ষক ঘটনা দেখানো। অতি গোপনে এ প্রস্তুতি সম্পন্ন করা হয়। সময় এবং অনুষ্ঠান নির্ধারণের পরিকল্পনাও ছিল নিখুঁত। বীযু উৎসবকে সামনে রেখে এ প্রস্তুতি সম্পন্ন করা হয়। যা বাস্তব রূপ দিতে পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ সক্ষম হয়। অতিথিদের কেউ তাঁদের এ ভ্রমণের অন্যদিকটার কথা জানতেন না। উপজাতীয় হত্যার ঘটনা পার্বত্য চট্টগ্রামে গত তিন বছরে একেবারেই ঘটেনি। ১৯৮৬ সালের পর ৮৯ পর্যন্ত যা ঘটেছে তার পিছনে সন্ত্রাসীদের হীন চক্রান্ত ছিল। সে সময় বাঙালীরা ক্ষিপ্ত হয়ে অনেক স্থানে উপজাতীয়দের হত্যা করেছে। সুকৌশলে বাঙালীদের ক্ষিপ্ত করার লক্ষ্যে সন্ত্রাসের পথ বেছে নিয়েছিল জনসংহতি সমিতির সশস্ত্র শান্তিবাহিনী। উদ্দেশ্য ছিল, ভীত সন্ত্রস্ত উপজাতীয়দের ভারতে শরণার্থী হিসাবে নিয়ে যাওয়া। এ লক্ষ্য তাদের সফলতার সাথে বাস্তবায়ন হয়েছে। তখন ভারতে অনেক শরণার্থী আশ্রয় নিয়েছিল। পরবর্তীতে ভারতে যাওয়া শরণার্থীদের মধ্যে ২৬ হাজারেরও বেশী দেশে চলে আসায় জনসংহতি পরিষদ তথা শান্তিবাহিনী উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে। কারণ শরণার্থীরা আজ পরিণত হয়েছে আন্তর্জাতিক দৃষ্টি আকর্ষণের হাতিয়ার হিসাবে। প্রায় সাড়ে তিন বছর পর লোগাংও আবার ইতিহাসের পুনরাবৃত্তিতে নিরাপত্তা বাহিনীকে ভাবিয়ে তুলছে। কারণ এক্ষেত্রেও ঘটনার শুরু হয় শান্তিবাহিনীর হাতে তিনজন বাঙালী রাখাল আক্রান্ত হবার মধ্য দিয়ে।

বীযু উৎসবে যোগদানের জন্য ঢাকা থেকে পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের আমন্ত্রণে যে প্রতিনিধি দলটি খাগড়াছড়ি গিয়েছিল, তারা খুবই ব্যস্ত ছিল। ১২ এপ্রিল পানছড়ি থেকে ফিরে বীযু উৎসবের মঞ্চে আয়োজিত হলো শোকসভা। উৎসব পরিণত হলো শোকসভায়। জ্বালাময়ী বক্তৃতা দিলেন আমন্ত্রিত অতিথিদের মধ্যে অনেকেই। কিন্তু তখনও তাদের পার্বত্য চট্টগ্রামে ২৪ ঘন্টাও অবস্থান করা হয়নি। এছাড়াও এসব শোকাহত অতিথিদের অনেকেই সন্ধ্যার পরে শোক ভুলে আনন্দ উৎসবে মেতে রইলেন।

# "শান্তিবাহিনী" সমস্যা জিইয়ে রেখে ফায়দা লুটছে একটি দেশ

দুর্গম ও গহীন জঙ্গল, খরস্রোতা নদী ও ছোট বড় উঁচু পাহাড়ঘেরা অপরূপ ও অকৃপন প্রকৃতির দান নিয়ে যুগ যুগ ধরে নিজের অবস্থানে অম্লান হয়ে আছে পার্বত্য চট্টগ্রাম। এমন অরণ্য, এমন পাহাড়মালা, এত ভূমি, এত ঝর্ণা, এত হ্রদ বাংলাদেশের আর কোথাও নেই। পর্বতমালার মাঝে মাঝে সমতল ও উপত্যকার মধ্য দিয়ে বয়ে গেছে নদী শঙ্খ, মাতামুহরী, চেংগী, মাইনী, ফাসালং রাইকাং। হাজার থেকে তিন হাজার ফুট উঁচু পাহাড় রয়েছে এ পার্বত্য অঞ্চলের পাঁচ হাজার বর্গ মাইল জুড়ে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলে ৫ হাজার ৯৩ বর্গ মাইল এলাকা জুড়ে অবস্থিত। যা বাংলাদেশের আনুমানিক এক দশমাংশ। এর উত্তর এবং পশ্চিম সীমান্তে ভারতের ত্রিপুরা রাজ্য, পূর্বে ভারতের মিজোরাম, পূর্ব এবং দক্ষিণে বার্মা এবং পশ্চিমে চট্টগ্রাম জেলা। এলাকাটি উঁচু নীচু পাহাড় দ্বারা পরিবেষ্টিত। এর মধ্যবর্তী অংশে ৩৫০ বর্গ মাইল এলাকা জুড়ে কাপ্তাই লেক। তাছাড়া ১৪০০ মাইল এলাকা জুড়ে রয়েছে সংরক্ষিত বনাঞ্চল।

উঁচু- নীচু ও পাহাড়ী অঞ্চলকে নিয়ে ষড়যন্ত্র আজও শেষ হয়নি। প্রতিবেশী দেশ ভারতের ভূখন্ডে আশ্রয় নিয়ে বিদেশী মদদে শান্তিবাহিনী দীর্ঘ ১৭ বছর ধরে সন্ত্রাস চালিয়ে যাচ্ছে। অস্থির করে রেখেছে গোটা পার্বত্য অঞ্চলটিকে। সামান্য ইস্যুকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক ও আঞ্চলিকতার ধুয়া তুলে জীবনযাত্রা ও উন্নয়নকে করছে ব্যাহত। দেশের স্বাভাবিক পরিবেশ ও উন্নয়নের ধারাকে বিঘ্নিত করার হীন উদ্দেশ্য দীর্ঘদিন ধরে জিইয়ে রাখা হয়েছে। এ অশান্তির বিষবাষ্প তথাকথিত স্বায়ত্তশাসনের আশায় উপ-জাতীয় সম্প্রদায়গুলো বিভিন্ন দুষ্কৃতকারীদের জড়ো করে গঠন করেছে তথাকথিত শান্তিবাহিনী। যারা গহীন জঙ্গলে এবং সীমান্তের ওপাড়ে ভারতের মিজোরাম ও ত্রিপুরা অঞ্চলে অবস্থান নিয়ে ঘটিয়ে চলেছে একের পর এক বর্বরোচিত মর্মান্তিক হত্যাকান্ড। সরকারের উদারতা এবং নমনীয়তার সুযোগে এক শ্রেণীর উপজাতীয় নেতা প্ররোচিত হয়ে ব্যক্তিগত উদ্দেশ্যকে চরিতার্থ করার জন্য জিইয়ে রাখছে এ শ্বেত সন্ত্রাস। পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রায় ৯ লাখ অধিবাসী আজ এ সন্ত্রাসের কাছে জিম্মি।

পাঁচ হাজার বর্গমাইলের এই এলাকায় ১৩টি উপজাতির বসবাস। এরা হচ্ছেঃ চাকমা, মারমা, টিপরা, মুরং, তংচংগা, বোম, পাংখু, খুমি, উসাই, খিয়াং, চাক, লুসাই এবং রিয়াং। চাকমা, মারমা ও ত্রিপুরা উপজাতীয়রাই প্রধানতঃ সংখ্যায় বেশী। মোট ৯ লাখ জনসংখ্যার মধ্যে ৪১ ভাগই হচ্ছে বাঙালী (অ-উপজাতি)।

পার্বত্য চট্টগ্রামের ঘটনা নতুন কোন ইতিহাস নয়। উপমহাদেশ বিভক্তির পূর্ব থেকেই পার্বত্য চট্টগ্রামকে নিয়ে চলছে ষড়যন্ত্র। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান স্বাধীন হবার সময় পার্বত্য চট্টগ্রামকে পূর্ব পাকিস্তানের সাথে অন্তর্ভূক্ত করা হয়। তখন ভারতের এক শ্রেণীর নেতার প্ররোচনায় ও

প্রভাবে কিছু সংখ্যক চাকমা উপজাতীয় নেতা এ অন্তর্ভূক্তির বিরোধিতা করে ভারতের পতাকা রাঙামাটিতে উত্তোলন করেছিল। কিন্তু বৃটিশ সরকার রেড ক্লিফ সনদের মাধ্যমে যে অন্তর্ভূক্তি হয়, তার বিরোধিতা করেও চাকমা নেতা কামিনী মোহন দেওয়ান ও স্নেহ কুমার চাকমা তখন ব্যর্থ হয়। তখন তারা ভারতে পালিয়ে যায়। সেই সময় থেকেই প্রথম পার্বত্য চট্টগ্রামে অশান্তির ও বিচ্ছিন্নতার বীজ বপন হয়। ভারতের উস্কানীতে তখন থেকেই আগুন নিয়ে খেলতে থাকে উপজাতীয় উচ্চাভিলাষী নেতারা। পরে ১৯৬২ সালে কাপ্তাই জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনকালে প্রায় ৪৫ হাজার একর উর্বর জমি জলমগ্ন হয়। এতে রাঙামাটি শহর পর্যন্ত পানির নীচে তলিয়ে যায়। অপরদিকে প্রায় ১লাখ উপজাতি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ফলে উপজাতীয়রা বাধা দেয়। তৎকালীন সরকার ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসনসহ ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করে। কিন্তু সরকারের অভ্যন্তরে লুকিয়ে থাকা ষড়যন্ত্রকারীরা যৎসামান্য সাহায্যই ক্ষতিগ্রস্তদের হাতে পৌছায়। এতে করে উপজাতীয় নেতারা আরো ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। তারা উপজাতীয় অধিবাসীদের বুঝাতে সক্ষম হয় সরকার উপজাতীয়দের ধ্বংস করার জন্য ইচ্ছা করেই সুপরিকল্পিতভাবে জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন করেছে। ক্ষতিগ্রস্ত উপজাতীয়রা পাহাড়ের বিভিন্ন এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে। এক অংশ ভারতে গিয়ে আশ্রয় নেয়। এতে করে সরকার বিরোধী চাপা উত্তেজনা দিন দিন বৃদ্ধি পেতে থাকে। ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় উপজাতীয়রা নিরপেক্ষতা অবলম্বন করলেও তাদের অনেকেই পাকিস্তানের পক্ষ অবলম্বন করে। কারণ, সে সময় চাকমাদের রাজা ত্রিদিব রায় পাকিস্তানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় চাকরি করতেন। স্বাভাবিকভাবে তারা বাংলাদেশ সরকারকে মেনে নিতে পারেনি। যেহেতু উপজাতীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে চাকমাদের শিক্ষিতের হার বেশী সেহেতু নেতৃত্বের সারিতে চাকমারাই এগিয়ে ছিল, এখনও রয়েছে। তারাই বিভিন্ন সময় নীতি নির্ধারনের ভূমিকা এবং গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলো সমাধা করতো। ত্রিদিব রায়ের ভূমিকা স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় বিতর্কিত হয়ে উঠলে দেশ স্বাধীন হবার পর তিনি পাকিস্তানে বসবাস শুরু করেন। বর্তমানে তারই ছেলে দেবাশীষ রায় চাকমাদের রাজা হিসাবে নেতৃত্বে রয়েছেন।

দেশ স্বাধীন হবার পরপরই প্রয়াত মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা ও পার্বত্য চট্টগ্রামের আরো কিছু উপজাতি প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের দাবী উত্থাপন করে। তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী মরহুম শেখ মুজিবুর রহমান এ দাবী প্রত্যাখ্যান করে উপজাতীয়দের সমস্যার সমাধানকল্পে একটি কমিটি গঠন করেন। সে কমিটিতে উপজাতীয় প্রতিনিধিও রাখা হয়। ১৯৭৩ সালে দেশের প্রথম সাধারণ নির্বাচনে মানবেন্দ্র লারমা উপ-জাতীয়দের এলাকা থেকে স্বতন্ত্র সদস্য হিসাবে জাতীয় সংসদের সদস্য নির্বাচিত হয়। স্বায়ত্বশাসনের দাবী প্রত্যাখ্যাত হওয়ায় তিনি সশস্ত্র আর্মড ক্যাডার সৃষ্টি করেন যার নাম দেন শান্তিবাহিনী। ১৯৭৪ সালের গোড়ারদিকে একটি পুলিশ পেট্রোলকে এ্যামবুশের মাধ্যমে শান্তিবাহিনীর সশস্ত্র তৎপরতা শুরু হয়।

এদিকে ১৯৮৩ সালে পার্বত্য চট্টগ্রামেকে রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান এ তিনটি জেলায় বিভক্ত করে এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড গঠন করা হয়। এ তিনটি জেলায়কয়েক হাজার বর্গমাইল এলাকায় বসবাস করে মাত্র কয়েক লাখ অধিবাসী। অথচ এখানে কোটিরও বেশী মানুষের জনবসতি গড়ে তোলা সম্ভব। মূল ভূখন্ডের ১০ ভাগ ভূমি পার্বত্য অঞ্চলে

অব্যবহৃত থাকায় শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের সরকার অ-উপজাতীয়দের পুনর্বাসনের উদ্যো'গ গ্রহণ করেন। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে নদী ভাঙ্গনে ক্ষতিগ্রস্তদের ও ভাসমান লোকদের পুনর্বাসন করা হয়। অ-উপজাতীয়দের পুনর্বাসনের ভ্রান্ত ব্যাখ্যা তখন থেকেই উপজাতীয়রা প্রচার করতে থাকে। উপজাতীয়দের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ধর্মের পবিত্রতা বিনষ্ট; জোর করে মুসলমান করাসহ বিভিন্ন মিথ্যা প্রচার করে সাধারণ উপজাতীয়দের কানভারী করে তোলা হয়। পুনর্বাসনের পাশাপাশি পুরো পার্বত্য অঞ্চলে উন্নয়নের জোয়ার বইতে শুরু করে। রাস্তা-ঘাট, পুল, বিল্ডিং, বিদ্যুৎ, ফোন থেকে শুরু করে উন্নয়নের সবকিছুই শুরু হয়। পার্বত্য অঞ্চলের উন্নয়নের জন্য এ পর্যন্ত প্রায় দেড় হাজার কোটি টাকা সব মিলিয়ে খরচ করা হয়েছে।

অ-উপজাতীয়দের পুনর্বাসনের পর থেকেই তথাকথিত শান্তিবাহিনী সমগ্র উপজাতীয়দের সমর্থন লাভে সক্ষম হয়। ১৯৮৫-৮৬ সালে পরিস্থিতি চরম আকার ধারণ করে এবং শান্তিবাহিনী একের পর এক অ-উপজাতি জনবসতির উপর হামলা চালিয়ে হত্যা এবং তাদের বাড়ীঘরে অগ্নিসংযোগ করে। এতে নারী -পুরুষসহ দেড় হাজার অ-উপজাতি বাঙালী নিহত হয়। আহত হয় প্রায় এক হাজার। অব্যাহত শান্তিবাহিনীর হামলার ফলশ্রুতিতে উপজাতি ও অ-উপজাতির মধ্যে যে দাংগার সৃষ্টি হয় তাতে প্রায় ৩০ হাজার উপজাতি ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যে আশ্রয় নেয়। '৮৭ সালে বাংগালী অধিবাসীদের উপর শান্তিবাহিনীর ক্রমবর্ধমান হামলার পরিপেক্ষিতে অ-উপজাতি অধিবাসীদের জীবনের নিরাপত্তা বিধানের জন্য তাদের নিজ আবাসস্থল থেকে সরিয়ে এনে নিরাপত্তা বেষ্টনীর ভিতর গুচ্ছগ্রামে আশ্রয় দেয়া হয়। সে অবধি আজ পর্যন্ত সকল অ-উপজাতি অধিবাসী সপ্তাহে ২১ কেজি চালের উপর নির্ভর করে বেঁচে আছে। বর্তমানে তারা সকল প্রকার অর্থনৈতিক কর্মকান্ড থেকে বঞ্চিত হয়ে মানবেতর জীবন যাপন করছে। তথাকথিত শান্তিবাহিনীর অব্যাহত সন্ত্রাসী হামলা এবং প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা বাহিনীর অভাবে এখন পর্যন্ত তাদেরকে স্ব-স্ব-অবস্থানে ফেরত পাঠানো সম্ভব হয়নি। একটি দেশের নাগরিক হয়ে একই দেশে অবস্থান করে পাহাড়ীরা রয়েছে রাজার হালে আর অ-উপজাতি বাঙালীরা রয়েছে বলতে গেলে রিফুইজি হয়ে। যা একমাত্র স্বচক্ষে দেখলেই বিশ্বাসযোগ্য হতে পারে, অন্যথায় নয়।

# শান্তিবাহিনীর হাতে ১৪শ' লোক নিহত
# বোমা মেরে উড়িয়ে দেয়ার নয়া কৌশল

মারিস্যা, লংদু, দীঘিনালা, কাটানল, আমতল, ক্ষিরাম, গঙ্গারামঘাট, বরকল, সোসাইও বাঘাইছড়ি সাম্প্রতিক কালের তথাকথিত শান্তিবাহিনীর কয়েকটি সন্ত্রাসী পয়েন্ট। যেখানে নিরীহ বাংলা ভাষাভাষী নিরপরাধ শিশু, নারী ও পুরুষের জীবন তুচ্ছ ও নগণ্য। হাত-পা বেঁধে মাত্র পাঁচ গজ দূরে দাঁড়িয়ে ব্রাশ ফায়ার করে নৃশংসভাবে এবং ঠান্ডা মাথায় এদের হত্যা করছে শান্তিবাহিনী। তাদের এ হামলা মধ্যযুগীয় বর্বরতাকেও হার মানিয়েছে। কি তাদের অপরাধ? অপরাধ, জীবন ও জীবিকার জন্য কেন তারা পাহাড়ে ফসল ফলাতে চাচ্ছে, কেন নদীতে জাল ফেলে মাছ ধরছে? কেন তারা সামান্য পারিশ্রমিকের বিনিময়ে কর্ণফুলী পেপার মিল-এর জন্য গহীন জঙ্গলে বাঁশ কাটছে? বিংশ শতাব্দীর দ্বারপ্রান্তে এসেও চলছে এমন নারকীয় ঘটনা।

তথাকথিত শান্তিবাহিনী গত কয়েক মাসের ব্যবধানে খাগড়াছড়ি ও রাঙামাটি পার্বত্য জেলার উল্লেখিত সন্ত্রাস পয়েন্টে কমপক্ষে ৫০ জনকে নৃশংসভাবে খুন ও ৪০ জনকে আহত করেছে। অপহরণ করেছে ৩০ জনকে। সাম্প্রতিক কালের বেশ কয়েকটি ঘটনা পার্বত্য জনজীবনে সৃষ্টি করেছে নতুন করে ভীতি ও অনিশ্চয়তা। সম্প্রতি এক গভীর রাতে দীঘিনালার উত্তর গবাখালিতে একটি গুচ্ছগ্রামে এসএমজি'র ব্রাশ ফায়ারে ৩ জনকে হত্যা করে। গভীর রাতে গ্রামবাসীরা যখন ঘুমে আচ্ছন্ন তখন শান্তিবাহিনী ঘুমন্ত মানুষের উপর এ হামলা চালায় এবং এতে ৩ জন মারা যায়। একইভাবে তারা লোগং-এ ১১বছরের বালক কবীরকে কুপিয়ে হত্যা করে।

এক পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, তথাকথিত এ শান্তিবাহিনীর হাতে গত ১২ বছরে বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রামে চৌদ্দশ' ব্যক্তি নিহত এবং সাড়ে সাত শত আহত হয়েছে। অপহৃত হয়েছে পাঁচশ ব্যক্তি। শুধু তাই নয়, এদের হাতে নিরাপত্তা বাহিনীর ৬ জন অফিসারসহ ৩৯৭ জন জোয়ান জীবন দিয়েছে। সর্বশেষ ঘটনাটি ঘটে গত ৯ মে কনস্টেবল আনিসুল হককে হত্যার মধ্য দিয়ে। এর আগে ১৯৯০ সালের ১৯ সেপ্টেম্বর ইষ্ট বেঙ্গলের সিপাহী আবদুস সবুর শাহাদাত বরণ করে হাতিমারা এলাকায়। তার আগে মেজর মহসীন ১৯৮০ সালের ১ মার্চ ও দ্বাদশ বেঙ্গলের লেফটেন্যান্ট আহসানুল হক মাইণ্ডাছড়ায় শহীদ হন। দিনটি ছিল ১৯৭৮ সালের ২ সেপ্টেম্বর। এছাড়া চোরাগোপ্তা হামলায় আহত হয় ৩৪৭ জন জোয়ান। যাঁদের অনেকেই পঙ্গু জীবন যাপন করছেন। এরা বিগত দিনগুলোতে কমপক্ষে ৪২০ টি সশস্ত্র হামলার ঘটনা ঘটিয়েছে। একের পর এক নিরস্ত্র ও নিরীহ বাংলা ভাষাভাষীদের উপর হামলা, রাতের আঁধারে ঘুমন্ত মানুষের উপর আক্রমণ করে নির্বিচারে নারী-পুরুষ, শিশু হত্যা, অগ্নিসংযোগ, নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা হয়ে দাঁড়ায়। এসব হায়েনার হাত থেকে জনসাধারণকে রক্ষাকল্পে দুর্গম পাহাড়ে-জঙ্গলে নিরাপত্তা বাহিনীর ক্যাম্প স্থাপন করে অপারেশন জোরদার করা হয়। এক

পর্যায়ে শান্তিবাহিনীর অপারেশন ও নেটওয়ার্ক ছিন্ন হয়ে পড়ে। পাশাপাশি পার্বত্য এলাকার সমস্যা সমাধানে রাজনৈতিক প্রক্রিয়া, সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা ও অর্থনৈতিক উদ্যোগ কার্যকরী হওয়ায় শান্তিবাহিনী ধীরে ধীরে গণবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। ১৯৮৩ সালের ১০ নভেম্বর শান্তিবাহিনীর প্রীতি গ্রুপের হাতে এম এন লারমা মৃত্যুবরণ করলে প্রীতি গ্রুপের বিরাট সংখ্যক সদস্য অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে নিরাপত্তা বাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করার পর থেকে শান্তিবাহিনীর মেরুদন্ড প্রায় ভেঙ্গে যায়। কিন্তু সন্ত্রাসী তৎপরতা অব্যাহত থাকে।

সামরিক বাহিনীর একটি সূত্র মতে, বর্তমানে সন্ত্রাসীদের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত জনবল পাঁচ হাজার। এর মধ্যে মাত্র দেড় হাজার নিয়মিত অস্ত্রধারী। পর্যায়ক্রমে আত্মসমর্পণ ও দল ছেড়ে লোকালয়ে চলে আসায় সশস্ত্র ব্যক্তিদের সংখ্যা অর্ধেকেরও নীচে নেমে গেছে। সূত্র মতে, শান্তিবাহিনীর বেশীর ভাগ অস্ত্র-গোলাবারুদ ও বিস্ফোরক প্রতিবেশী দেশ ভারত থেকে প্রাপ্ত। ওই দেশে তৈরী চেক রাইফেল থেকে শুরু করে মেশিনগান পর্যন্ত তাদের কাছে রয়েছে। যখনই তারা নতুন অস্ত্র পেয়েছে, তখনই তাদের হামলা ও হত্যাকান্ড বেড়েছে।

পার্বত্য অঞ্চলে বসবাসকারী শান্তিপ্রিয় মানুষের জানমালের নিরাপত্তার স্বার্থে নিরাপত্তা বাহিনীর তৎপরতা বিশেষ করে কাউন্টার ইনসারজেন্সীর নেটওয়ার্ক গড়ে তোলায় এবং জনসমর্থন হ্রাস পাওয়ায় শান্তিবাহিনীর দুর্বৃত্তদের অবস্থান এখন সীমান্তের ওপাড়ে ও গহীন জঙ্গলে।

সন্ত্রাসীরা গেরিলা যুদ্ধের রণকৌশল ব্যবহার করে থাকে। আনসার, ভিডিপি, বিডিআরসহ সেনা বাহিনীর জোয়ানরা নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করায় গত কিছুদিন থেকে তারা সন্ত্রাস চালানোর ক্ষেত্রে বোমা হামলাকে নতুন কৌশল হিসাবে বেছে নিয়েছে। সড়কে চলাচলকারী যানবাহন, বাজার-হাট ও নিরাপত্তা বাহিনীর ক্যাম্প ও লঞ্চ এখন তাদের টার্গেট। এছাড়া বাংলা ভাষাভাষী এবং স্থানীয় সরকার পরিষদের পক্ষের উপজাতীয়দের হত্যা, ভীতি প্রদর্শন এবং জাতিগত দাঙ্গার মাধ্যমে ভারতে শরণার্থী নিয়ে যাওয়া বর্তমানে শান্তিবাহিনীর নতুন রণকৌশল।

সম্প্রতি পার্বত্য অঞ্চল সফরকালে বিভিন্ন সূত্রে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী গত বছরের মার্চ থেকে বোমা হামলা বৃদ্ধি পায়। কিন্তু পাল্টা ব্যবস্থা হিসাবে সেনাবাহিনীর জোয়ানরা প্রতিদিন রাস্তা পরীক্ষা ও পাহাড়ের চূড়ায় চূড়ায় নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যদের সতর্ক অবস্থায় রাখার মধ্য দিয়ে বোমা হামলার হার শূন্যের কোঠায় নেমে আসে। "হিট এন্ড রান" পদ্ধতিতে হামলা চালায় বলে শান্তিবাহিনীর সদস্যরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়।

আত্মসমর্পণকারী শান্তিবাহিনীর সদস্যদের সাথে আলাপকালে জানা গেছে, ভারতের ত্রিপুরা ও মিজোরামে এবং বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তের কাছাকাছি তথাকথিত শান্তিবাহিনীর শত শত আস্তানা রয়েছে। ত্রিপুরায় অবস্থানরত উপজাতীয় শরণার্থীদের বাংলাদেশে ফিরে আসতে শান্তিবাহিনী বাধা দিচ্ছে। তারা তাদেরকে নিজ স্বার্থে ব্যবহার করে আসছে। শরণার্থী দেখিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যাকে একটি মানবিক ও মানবাধিকার সমস্যা হিসাবে আন্তর্জাতিকীকরণের প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। শরণার্থী শিবিরের সাহায্য থেকে শান্তিবাহিনী তাদের রশদ ক্রয় করছে এবং

ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থার সাহায্যে শরণার্থীদের মধ্য থেকে নতুন করে সদস্য সংগ্রহ করা হচ্ছে। শরণার্থী সমস্যা সমাধানে তারা মোটেও আগ্রহী নয়, বরং পার্বত্য অঞ্চলের অ-উপজাতীয়দের হত্যা এবং উপজাতি ও অ-উপজাতীয়দের মধ্যে দাঙ্গা লাগিয়ে দিয়ে নতুন শরণার্থী সমস্যা সৃষ্টির জন্য উপর্যুপরি অপচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু তাদের সে প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে।

খাগড়াছড়ি সফরকালে আত্মসমর্পণকারী শান্তিবাহিনীর সদস্যদের মধ্যে সুনীতরঞ্জন চাকমা প্রণাম কুমার, অনিমেষ দেওয়ান, উপিয়ুজয়া মারমা, দিপ্তীময় দেওয়ান, গোবিন্দ চাকমা, নন্দন চাকমা ও শুভমান চাকমার সাথে কথা হয়। তাদের সকলেরই অভিমতঃ ভারতে অবস্থানরত শরণার্থীরা অত্যন্ত মানবেতর জীবনযাপন করছে। তারা প্রতিদিন পালিয়ে আসার চেষ্টা করছে। কিন্তু শান্তিবাহিনীর সদস্যদের চোখকে ফাঁকি দিয়ে সীমান্ত পাড়ি দিতে পারছে না। তারপরও রাতের অন্ধকারে পাহাড়ের চূড়ার মধ্য দিয়ে চুপি চুপি পায়ে হেঁটে প্রতিদিন শরণার্থীরা স্বদেশে ফিরে আসছে।

## শান্তিবাহিনীর শ্রেণী বিভাগ

তথাকথিত শান্তিবাহিনী নিজেদের মধ্যে তিনটি ইউনিটে বিভক্ত সশস্ত্র গেরিলা। মেডিকেল শাখা এবং উৎপাদন ও বন্টন শাখা। মানবেন্দ্র লারমার হত্যার পর তারই ছোট ভাই সান্তু লারমা বর্তমানে শান্তিবাহিনীর নেতৃত্ব দিচ্ছে। পার্বত্য তিনটি জেলা বান্দরবান, রাঙামাটি এবং খাগড়াছড়িকে তারা ছয়টি জেলায় পুনর্বিন্যাস করেছে সন্ত্রাসী তৎপরতা চালানোর সুবিধার্থে। বাংলাদেশের সমতল ছয়টি জেলার নামে নামকরণ করে বর্তমানে শান্তিবাহিনী তাদের তৎপরতা অব্যাহত রেখেছে। মাটিরাঙা, কাউখালি, ও রাঙামাটির নাম যশোর জেলা; দীঘিনালা, পানছড়ি ও মহিছড়ির নাম সিলেট জেলা; রুমা, রুহানছড়ি ও আলিকদম-এর নাম ঢাকা জেলা; নাইকনছড়ি, বিলাইছড়ি ও মানিকছড়ির নাম রংপুর জেলা; লংদু উপজেলার নাম বগুড়া ও জুড়াছরি, বরকল ও কাপ্তাই'র নাম কুমিল্লা জেলা।

শান্তিবাহিনীর সশস্ত্র এবং সাংগঠনিক কাঠামোর বর্তমান দায়িত্বে রয়েছে, কেন্দ্রীয় কমিটির চেয়ারম্যান ও সশস্ত্র বাহিনীর প্রধান কমান্ডার সান্তু লারমা। ভাইস চেয়ারম্যান সমিরুল চাকমা, সেক্রেটারী অশোক গৌতম, পলিটিক্যাল সেক্রেটারী নিথিষ ও বৈদেশিক সেক্রেটারী মিহির বাবু।

# সুযোগ–সুবিধাভোগ করেও সরকারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র

পঞ্চান্ন হাজার বর্গমাইলের বাংলাদেশে পঞ্চাশ হাজার বর্গমাইলে বাস করছে ১১ কোটি মানুষ। আর ৫ হাজার বর্গমাইলে বাস করছে ৯ লাখ মানুষ। ৫ হাজার বর্গমাইলের মধ্যে বাস করছে ১কোটির বেশী মানুষ; অন্যদিকে পার্বত্য চট্টগ্রামে ১ হাজার বর্গমাইলে মানুষের বাস ২ লাখেরও কম। কিন্তু তার জন্য পার্বত্য অঞ্চলের উন্নয়ন থেমে থাকেনি। বরং সমতল এলাকার চেয়ে পার্বত্য এলাকায় উন্নয়নের জন্য কোটি কোটি টাকা বেশী খরচ হয়েছে।

সর্বশেষ হিসাব মতে, উন্নয়নের জন্য ব্যয় হয়েছে দেড় হাজার কোটি টাকা। বাংলাদেশে যেখানে শিক্ষিতের হার ২২ শতাংশ, সেখানে পার্বত্য অঞ্চলের চাকমাদের শিক্ষিতের হার ৫৭ শতাংশ। সমতল ভূমির এম এ পাস করা যুবকরা জীবন ধারণের তাগিদে যখন বিকল্প টেক্সী চালায়, হকারী করে, তখন সেখানে মেট্রিক পাস করা একজন উপজাতির জন্য সরকারী চাকরি নিশ্চিত। বাংলাদেশের অন্যান্য এলাকার ছেলেমেয়েরা যখন স্টার মার্ক পেয়েও মেডিকেল ইঞ্জিনিয়ারিং–এ ভর্তি হতে পারছে না; ঠিক তখন মাত্র দ্বিতীয় বিভাগে এইচ এস সি পাসের মার্ক নিয়ে চাকমারা শুধু মেডিকেল, ইঞ্জিনিয়ারিং–এ ভর্তি হচ্ছে না, সরকারী বড় বড় চাকরির কোটাও দখল করছে ।

সরকারের দেয়া এসব সুযোগ–সুবিধা নিয়েও তারা ত্রিপুরা, মারমা, সোম, খুশী, উসাই ও লুসাইর মত ছোট ছোট উপজাতীয়দের উপর প্রতিষ্ঠা করছে সাংস্কৃতিক অধিপত্য।

বাংলাদেশের মত তৃতীয় বিশ্বের একটি অত্যন্ত দরিদ্র দেশে পার্বত্য অঞ্চলের আর্থ–সামাজিক অবকাঠামোর উন্নয়নে যে ঐকান্তিক প্রচেষ্টা নেয়া হয়েছে, তা বিশ্বের যে কোন উন্নত দেশকে বিস্মিত করবে। শিক্ষাখাতে ব্যয়ও অবিশ্বাস্য। ১৯৪৭ সালে যেখানে কোন কলেজ ছিল না, সেখানে আজ ৯টি কলেজ–এর মধ্যে ৩টি সরকারী। যেখানে মাধ্যমিক স্কুল ছিল ১টি· এখন সেখানে ৬২টি মাধ্যমিক স্কুল, যেখানে জুনিয়ার হাই স্কুল ছিল না ১টি, সেখানে এখন ৩৩টি, প্রাথমিক স্কুল ছিল ২০টি, সেখানে এখন ৯শ ৩৮টি, উপজাতীয় ছাত্রাবাস এখন ৯টি, ছাত্রাবাস সহ রেসিডেন্সিয়াল স্কুল ২টি। শিক্ষিতের হার যেখানে ছিল ১৯৪৭ সালে শতকরা ২ দশমিক ৩ ভাগ, এখন হয়েছে শতকরা ২০ ভাগ। এদের মধ্যে চাকমা উপজাতীয়দের শিক্ষার হার ৫৭ ভাগ।

শিক্ষা ছাড়াও স্বাস্থ্য, সড়ক ও বিদ্যুৎ খাতেও হয়েছে অভাবিত উন্নতি। ১৯৭৫ সালে যেখানে মাত্র ৭২ কিলোমিটার সড়ক পথ ছিল এখন সেখানে ৭শ' ৫২ কিলোমিটার সড়ক পথ, সকল উপজেলায় বিদ্যুৎ ও টেলিফোন, এমনকি এনডব্লিউডি সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। '৭৫ সালে রাঙামাটিতে যেখানে ৩১ শয্যাবিশিষ্ট একটি হাসপাতাল ছিল, সেখানে ১শ শয্যাবিশিষ্ট

খাগড়াছড়ি ও বান্দরবানে ৫০ শয্যাবিশিষ্ট আধুনিক হাসপাতালসহ ৬টি উপজেলা সদরে ৩১ শয্যাবিশিষ্ট হাসপাতাল ও প্রতিটি উপজেলায় স্বাস্থ্য প্রকল্প প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

বাংলাদেশের মত একটি উন্নয়নশীল দেশে যেখানে শিক্ষিত ও দক্ষ বেকারের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে, সেখানে উন্নয়ন ব্যয়ের পাশাপাশি উচ্চ শিক্ষা ও কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রেও সরকার উপজাতিদের জন্য সমতল ভূমির লোকের চেয়ে বেশী সুবিধার ব্যবস্থা করেছে। যে চাকরিতে একজন অ-উপজাতিকে উচ্চ মাধ্যমিক যোগ্যতার অধিকারী হতে হয়, সেখানে মাধ্যমিক যোগ্যতাসম্পন্ন একজন উপজাতি যোগ্য বলে বিবেচিত। পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতীয় ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষা ক্ষেত্রে বিশেষ সুবিধা প্রদানের জন্য বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আসন সংরক্ষিত রয়েছে। এর মধ্যে চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় ১২টি, ডেন্টাল মহাবিদ্যালয় ১টি, প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় ১টি, প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় ঢাকা ২টি, বিআইটি চট্টগ্রাম ২টি, বিআইটি রাজশাহী ২টি, কারিগরি বিদ্যালয় রাঙামাটি ১০টি, চট্টগ্রাম ৫টি, ফেনী ৫টি, কুমিল্লা ৫টি, সিলেট ৫টি, ময়মনসিংহে ৩টি, তেজগাঁও ৩টি, রাঙামাটি প্যারা মেডিকেল স্কুল প্রতি বছরের শূন্য আসনের হার ২০ ভাগ, ক্যাডেট কলেজ ফৌজদার হাটে ১টি, কুমিল্লায় ১টি, সিলেট ১টি ও ময়মনসিংহে ৩টি। দরিদ্র ও দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সীমিত সংখ্যক আসনের জন্য যেখানে অনেক মেধাবী ছাত্র উচ্চ শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত, সেখানে উপজাতীয় ছাত্ররা অপেক্ষাকৃত খারাপ ফলাফল করেও কোটা ভিত্তিতে সে সুযোগের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করছে। আর আজ একারণে চাকমাদের শিক্ষিতের হার ৫৭ ভাগ। দেশের সার্বিক শিক্ষার হারের তুলনায় যা দ্বিগুণেরও বেশী।

উল্লেখ্য, কিছুদিন আগেও প্রতিবেশী ভারতে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জন্য কোটা নির্ধারণের প্রতিবাদে বৃহত্তর জনগোষ্ঠী গায়ে আগুন লাগিয়ে আত্মহত্যা করার মত ঘটনা ঘটিয়ে প্রতিবাদ করছিল। অথচ দুঃখজনক হলেও সত্য কোটি কোটি টাকা ব্যয় করে যাদেরকে বস্ত্র পরিধান শেখানো হলো, সভ্য জগতের আলো পৌঁছে দেয়া হলো যাদের দোরগোড়ায়, সমতল ভূমির মানুষ তথা বৃহত্তর জনগোষ্ঠীকে একপ্রকার বঞ্চিত করে বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা প্রধান করা হলো, তারা আজ শিক্ষার আলো পেয়ে পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের নামে শান্তিবাহিনীর বি-টিম হয়ে প্রকাশ্যে দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত।

বৃহত্তর জনগোষ্ঠী বাংলা ভাষাভাষীদের আজ তাই প্রশ্নঃ দেশে এখনো এমন এলাকা আছে, যেখান থেকে রাজধানীতে পৌঁছতে ২/৩ দিন লেগে যায়। এমন অনেক উপজেলা আছে, যেখানে আজো বিদ্যুৎ পৌঁছেনি, এমন অনেক গ্রাম আছে যেখানে মাইলের পর মাইল কাঁচা রাস্তা পার হয়ে ছাত্রদের স্কুলে যেতে হয়, সেখানে আজ পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজেলাগুলো হতে ১০ থেকে ১২ ঘন্টার মধ্যে রাজধানীতে পৌঁছা যায়। প্রায় ৫ লাখ উপজাতীয় জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য বাংলাদেশের মত দরিদ্র দেশের পক্ষে আর কি করা সম্ভব?

# ৮৮ গুচ্ছগ্রামে দেড়লাখ অ-উপজাতি কার্যতঃ বন্দী

প্রায় দেড় লাখ অ-উপজাতি বাংলাভাষী মানুষ পার্বত্য চট্টগ্রামে অনিশ্চয়তার মুখোমুখি। তথাকথিত শান্তিবাহিনীর অব্যাহত হত্যা, লুট ও অগ্নিসংযোগের ফলে তারা আজ ৮৮টি গুচ্ছগ্রামে এক প্রকার বন্দী। বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর অংশ হয়েও নিজ দেশে তারা পরবাসী। পার্বত্য অঞ্চলের মোট জনসংখ্যার ৫০ ভাগ হয়েও শতকরা ৯৪ ভাগ আজ গ্রচ্ছগ্রামের অধিবাসী। তারা শান্তিবাহিনীর হামলার আশংকায় কোন অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে অংশ নেয়াতো দূরের কথা, এমনকি স্বাধীনভাবে চলাফেরা করতেও পারছে না। শিক্ষা-দীক্ষা, স্বাস্থ্য-চিকিৎসা-চাষাবাদ-খেলাধূলা সর্বক্ষেত্রেই তারা এক অনিশ্চিত ভবিষ্যতের মুখোমুখি। সরকার থেকে প্রতি সপ্তাহে বরাদ্দকৃত ২১ কেজি চালের উপরই তাদের সব কিছু নির্ভর করে। অথচ ভাবতেও অবাক লাগে, গুচ্ছগ্রামের কাছাকাছি চাকমাদের জন্য ২৭টি এবং ত্রিপুরাদের জন্য ৩৩টি যথাক্রমে 'শান্তিগ্রাম' ও বড়পাড়া রয়েছে।

এখানে বসবাসকারী উপজাতীয়রা নির্দ্বিধায় নির্ভয়ে চাষাবাদ থেকে শুরু করে সকল কর্মক্ষেত্রেই খোলামেলা ঘুরে বেড়াচ্ছে। শান্তিবাহিনী এদের কিছু বলে না। তাদের টার্গেট বাংলা ভাষাভাষী অ-উপজাতীয় মানুষ।

তাদের অভিসন্ধি অ-উপজাতীয়রা স্বজন হারানোর শোকে ক্ষিপ্ত হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়বে উপজাতীয়দের উপর। তখন ওরা প্রাণের ভয়ে পালিয়ে যাবে ভারতে। শরণার্থী হিসাবে ব্যবহৃত হবে এবং আন্তর্জাতিক দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাবে। যেমনটি হয়েছিল '৮৬ সালে। তাই ওরা ক্ষণে ক্ষণে অ-উপজাতীয়দের উস্কে দিতে চায়।

১৯৮০ সালের পর থেকেই অ-উপজাতি বসতির উপর শান্তিবাহিনীর নির্বিচারে হামলা, হত্যাকান্ড এবং পর পর কয়েকটি দাঙ্গার ঘটনায় পার্বত্য চট্টগ্রামের পরিস্থিতি কিছুটা অস্থিতিশীল হয়ে ওঠে।

অ-উপজাতীয়দের নিরাপত্তা বিধানকল্পে ১৯৮৮ সালে সকল বাংলা ভাষাভাষীকে নিরাপত্তা ছাউনির নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসা হয়। অনেকটা বাধ্যতামূলক এসব গুচ্ছগ্রামে তাদেরকে পুনর্বাসন করা হয়। পরে ১৯৯০ সালে ভারত থেকে ফিরে আসা উপজাতি শরণার্থীদের জন্য একইভাবে শান্তিগ্রাম ও বড়পাড়া সৃষ্টি করা হয়। সরকারী অর্থে নিরাপত্তা বাহিনীর সহায়তায় এসব গ্রাম প্রতিষ্ঠা করা হয়। বর্তমানে প্রতি পরিবারকে সপ্তাহে ২১ কেজি করে চাল দেয়া হচ্ছে। এক হিসাবে দেখা গেছে, প্রতিমাসে এসব গুচ্ছগ্রামের জন্য ১৮শ' মেট্রিক টন চাল প্রয়োজন হয়। যার মূল্য প্রায় ২ কোটি টাকা। ১৯৮৮ সাল থেকে এ পর্যন্ত প্রায় ৮ শ' কোটি টাকার খাদ্যশস্য বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়েছে বলে একটি সূত্র জানায়।

সম্প্রতি পার্বত্য চট্টগ্রামের কয়েকটি অঞ্চল সফরকালে অ-উপজাতীয়দের গুচ্ছগ্রাম পরিদর্শনকালে দেখতে পেয়েছি, অর্ধাহারে ও অনাহারে থেকে মানুষগুলো কঙ্কালসার হয়ে কোনোমতে বেঁচে রয়েছে। ছেলে-মেয়েদের পরণে কাপড় নেই। বয়স্কদের পরণে ছেঁড়া বস্ত্র। তথাকথিত শান্তিবাহিনীর সদস্যরা কাউকে স্বামীহারা, কাউকে ভাইহারা কাউকে ভিটেছাড়া করছে।

গত ২ মে পানছড়ির একটি গুচ্ছগ্রামের মৌলভী আলহাজ্ব কদম আলীর সঙ্গে কথা হয়। তিনি ১৯৮৩ সালে পিরোজপুর থেকে এখানে এসে বসবাস শুরু করেন। তিনি জানান, তারা কালোপাহাড়ে চাষাবাদ করে মোটামুটি ভালোভাবেই জীবন যাপন করছিলেন। কিন্তু একদিন গভীর রাতে শান্তিবাহিনীর ব্রাশ ফায়ারে স্বজনদের প্রাণ হারাতে হয়। দিনে দিনে গড়া সাজানো-গোছানো চাষাবাদের জমি ফেলে রেখে আজ তারা গুচ্ছগ্রামের অধিবাসী।

তিনি জানান, ১ হাজার পরিবার কালো পাহাড়ে বসবাস করতো। বর্তমানে উদ্বেগ উৎকণ্ঠার মধ্যে তারা দিনাতিপাত করছে। কারণ ৩০ জুন রেশন বন্ধ করে দেয়া হবে বলে তাদেরকে জানানো হয়েছে। পানছড়ি জোনের নিরাপত্তা কমান্ডার কর্ণেল মইনুদ্দিন আহমদ এসময় উপস্থিত ছিলেন।

একই দেশের নাগরিক হয়ে বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর একটি অংশ নিজ দেশেই পরবাসীর মতো জীবন যাপন করছে। স্থানীয় সরকার পরিষদ সৃষ্টির পর থেকে পার্বত্য অঞ্চলে সমতল ভূমির কোন লোক নতুন করে বাস করতে পারবে না। পারবে না কোন জমি ক্রয় করতে। প্রয়োজনীয় যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও পার্বত্য জেলার স্থানীয় সরকার পরিষদ নির্বাচনে চেয়ারম্যান পদে প্রার্থী হতে পারবে না। কিন্তু ভাবতেও অবাক লাগে, পার্বত্য অঞ্চলের যে কোন উপজাতি সমতল ভূমির যে কোন স্থানে বসবাস করা, জমি কেনা থেকে শুরু করে সব কিছুই করতে পারবে। একই দেশে দুই আইন।-যা করা হয়েছে সংবিধান সংশোধন করে। উপহার দেয়া হয়েছে অসম ক্ষমতাধর স্থানীয় সরকার পরিষদকে। যা চাকমাদের আশা আকাংক্ষার চেয়েও বেশী। স্থানীয় সরকার পরিষদের চেয়ারম্যানকে দেয়া হয়েছে উপমন্ত্রীর মর্যাদা। শিক্ষাখাত থেকে শুরু করে উন্নয়ন খাতের সব কিছুই ব্যয় করা হচ্ছে উপজাতি বিশেষ করে চাকমাদের জন্যে। অথচ সম্প্রতি নিরাপত্তা বাহিনী মৈত্রী কর্যক্রমের আওতায় উপজাতীয় সন্তানদের জন্য হোষ্টেলের ব্যবস্থা করেছে। কিন্তু শান্তিবাহিনীর নৃশংসতার শিকার হয়ে যেসব অ-উপজাতীয় সন্তান পথে পথে এতিম হয়ে ঘুরছে, তাদের জন্য কিছু করা হয়নি। এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক ৭৪ কোটি টাকা ব্যয়ে রাবার বাগান প্রতিষ্ঠা করে সেখানে উপজাতীয়দের পুনর্বাসনে শর্ত দিয়েছে। এ প্রকল্পে বাংলাদেশ সরকারের ১৭ কোটি টাকা ব্যয় হলেও এ পর্যন্ত ২ হাজার উপজাতিকে পুনর্বাসন করা হয়েছে। কিন্তু পুনর্বাসন করা হয়নি কোন অ-উপজাতিকে। স্থানীয় সরকার পরিষদ থেকে ঘূর্ণিঝড় কর্মসূচীসহ বিভিন্ন খাতে যে কোটি কোটি টাকা ব্যয় করছে, তার একটি টাকাও পায়নি কোন অ-উপাজাতি। পায়নি বিনা পয়সায় দেয়া সরকারী ট্রাক্টর। অথচ যে অ-উপজাতি

উপজাতিকে জমি চাষ করা শেখালো, তাদের জন্যে ট্রাক্টর জোটেনি। ট্রাক্টর তো দূরের কথা, অ-উপজাতিদের চাষের অধিকারটুকুও দিতে রাজী নয় উপজাতীয়রা। তারা আজ গুচ্ছগ্রামে কার্যত বন্দী। নিরাপত্তা বাহিনীর সহায়তা ছাড়া কোথাও বের হতে পারে না।

কমলাপুর রেল ষ্টেশন থেকে টঙ্গী পর্যন্ত রেল লাইনের দু'পাশের বস্তিতে বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর যতসংখ্যক মানুষ বাস করে তার সমান পার্বত্য অঞ্চলের উপজাতীয়দের জন্য সরকার গত ১০ বছরে ব্যয় করেছে কোটি কোটি টাকা। সবই করা হয়েছে সমস্যা সমাধানের জন্যে। কিন্তু সরকারের টাকায় লালিত পালিত হয়ে প্রতিবেশী দেশের ইঙ্গিতে উপজাতি বিশেষ করে চাকমারা যে সব অপপ্রচার চালাচ্ছে দেশ-বিদেশে সে ব্যাপারে অন্যান্য উপজাতীয়দের ভেবে দেখা উচিৎ।

*Fury of protest against genocide by so-called Shanti Bahini. Tribals and non-tribals alike demand trial of the killers.*

# ৫ দফার বেশীর ভাগ দাবী মেনে নেয়ার পরও স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার বিরোধিতা

শান্তিবাহিনী সরকারের দেয়া সাধারণ ক্ষমার সুযোগ নিয়ে এ পর্যন্ত অস্ত্রসহ সহস্রাধিক এবং অস্ত্র ছাড়া প্রায় ২২ শ' সদস্য আত্মসমর্পণ করেছে।

সাধারণ ক্ষমা ঘোষণার সিদ্ধান্তটি পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যার সমাধানকল্পে একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ। সরকারের এ ঘোষণার সুযোগ নিয়ে প্রায়শঃই শান্তিবাহিনীর সদস্যরা আত্মসমর্পণ করছে। লাভ করছে সরকারী বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা।

এসব সুযোগ সুবিধার মধ্যে রয়েছে, প্রতিটি এলএমজি'র জন্য ৩০ হাজার টাকা, প্রতিটি মর্টার ৩০ হাজার টাকা, এসএমজি ২৫ হাজার টাকা, রাইফেল (সেমি অটো) ২২ হাজার টাকা, প্রতিটি রকেট লাঞ্চার ২০ হাজার টাকা, রাইফেল ( বোল্ট এ্যাকশন) ১২ হাজার টাকা, পিস্তল ১০ হাজার টাকা, শর্টগান ৭ হাজার টাকা, অন্যান্য ছোট অস্ত্র প্রতিটি ৩ হাজার টাকা, বেতার যন্ত্র ১০ হাজার টাকা, প্রতিটি গ্রেনেড বা রকেট ও গোলার জন্য ১ হাজার টাকা, প্রতি রাউন্ড পরিমাণ বিস্ফোরক ৫শ' টাকা, প্রতিটি বুলেট ৫ টাকা ও প্রতিটি শর্টগান কার্তুজ ৩ টাকা। এছাড়া রয়েছে প্রত্যেকে ৫ একর করে জমি দেয়ার ব্যবস্থা। সর্বশেষ গণতান্ত্রিক সরকারের আমলে সাধারণ ক্ষমা ঘোষণার শর্তে আত্মসমর্পণকারীদের জন্য এসব সুযোগ-সুবিধা ঘোষণা করা হয়।

এক হিসাবে দেখা গেছে, ১৯৮৩ সালের ৩ অক্টোবর প্রথম দফা সাধারণ ক্ষমা ঘোষণার পর থেকে ২৫ এপ্রিল '৮৪ পর্যন্ত ১শ' ৪৬ জন অস্ত্রসহ, দ্বিতীয় দফায় ১৯৮৪ সালের ২৬ এপ্রিল থেকে ২৬ এপ্রিল ৮৫ পর্যন্ত ৭শ' ৫২ জন, অস্ত্রসহ ১ হাজার ১শ' ৮ জন; তৃতীয় দফায় ১৯৮৯ সালের ২২ এপ্রিল থেকে ২২ জুন পর্যন্ত ৫ জন, অস্ত্রসহ ১১ জন; চতুর্থ দফায় ১৯৮৯ সালের ২৩ আগষ্ট থেকে ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ১০ জন, অস্ত্রসহ ৩৭ জন; ১৯৮৯ সালে সশস্ত্র সদস্যসহ ৬০ জন ও ১৯৯০ সালে সশস্ত্র সদস্যসহ ২শ' ২৩ জন আত্মসমর্পণ করেছে।

শান্তিবাহিনীর কাছ থেকে পাওয়া অস্ত্রের অধিকাংশই ভারতের তৈরী। তাছাড়া চীন, যুক্তরাজ্য ও চেকোশ্লোভাকিয়ায় নির্মিত কিছু পুরানো অস্ত্র রয়েছে। উদ্ধারকৃত অস্ত্রের মধ্যে এসএমজি ৩৪টি, এলএমজি ১শ' ৫০টি, মর্টার ১০টি, শর্টগান ৪শ' ৫৪টি, রাইফেল ৩শ' ৭৪টি, গ্রেনেড ২শ' ৪৮টি, মাইন ২টি, পিস্তল ৩২টি, ও গোলাবারুদ ২ লাখ ৯৬ হাজার রাউন্ড।

পার্বত্য অঞ্চলের সমস্যা সমাধানে কোন সরকারেরই আন্তরিকতার অভাব ছিল না। ১৯৮৫ সালে স্বৈরাচারী সরকারও সমস্যা সমাধানে সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করা ছাড়াও অ-উপজাতীয় বসতি স্থাপন না করার সিদ্ধান্ত নেয়। পাশাপাশি চালানো হয় আলোচনা। ১৯৮৭ থেকে '৮৯-এর মধ্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি ও সরকারের মধ্যে ৬ বার বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

কিন্তু এসব বৈঠক জনসংহতি সমিতির নেতৃবৃন্দের এক গুঁয়েমি মনোভাবের কারণে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। এরপর থেকে আর কোন বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়নি। বর্তমান গণতান্ত্রিক পরিবেশে পুনরায় জনসংহতি সমিতিকে বৈঠকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে বলে একটি নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা গেছে। তবে তারা প্রথম বৈঠকেই বাংলাদেশ সরকারের কোন মন্ত্রীকে উপস্থিত থাকার শর্ত দিয়েছে। দুঃখজনক হলেও সত্য, সরকারের উদারতা ও সমস্যা সমাধানে আন্তরিকতার সুযোগকে দুর্বলতা মনে করে জনসংহতির নেতৃবৃন্দ অন্যায় আবদার করার মত ধৃষ্টতা দেখাতে সক্ষম হচ্ছে। উল্লেখিত অনুষ্ঠিত বৈঠকে জনসংহতি সমিতি যে পাঁচ দফা উপস্থাপন করেছে, তা বাংলাদেশের আঞ্চলিক অখন্ডতা ও সার্বভৌমত্বের পরিপন্থী।

দাবীগুলো হচ্ছে: (১) বাংলাদেশের সংবিধান সংশোধন ও পরিবর্তন করে পার্বত্য চট্টগ্রামকে পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন দিয়ে জুম্ম ল্যান্ড নামে অবহিত করা। (২) স্বায়ত্তশাসিত জুম্ম ল্যান্ডের সকল নির্বাহী কমকর্তা অবশ্যই উপজাতি হতে হবে এবং কোন অ-উপজাতি পার্বত্য অঞ্চলে বসবাস এমনকি অনুমতি ছাড়া প্রবেশ করতে পারবে না। পার্বত্য অঞ্চলে জরুরী আইন বা সামরিক আইন জারি করা চলবে না। (৩) ১৯৪৭ সাল থেকে এ পর্যন্ত যে সব অ-উপজাতীয় লোক পার্বত্য অঞ্চলে ভূমি ক্রয় বা বন্দোবস্তি করে আসছে, তাদেরকে তা ছেড়ে দিতে হবে, কাপ্তাই হ্রদের পানির উচ্চতা ৬০ ফুটে রাখতে হবে এবং ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসন করতে হবে। জনসংহতি সমিতির প্রতিটি সদস্যকে পুনর্বাসন এবং তাদের কারো বিরুদ্ধে মামলা থাকলে তা প্রত্যাহার করে নিতে হবে, কারারুদ্ধ সকল শান্তিবাহিনীর সদস্যসহ সকল শান্তিবাহিনীকে মুক্তি দিতে হবে। (৪) পার্বত্য চট্টগ্রামের জন্য একটি নিজস্ব ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করতে হবে। সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সিভিল সার্ভিসে, প্রতিরক্ষা বাহিনীর ও চাকুরিতে উপজাতীয়দের জন্য আসন সংরক্ষণ ও বিদেশে উচ্চ শিক্ষা লাভের সুযোগ দিতে হবে এবং অত্র অঞ্চলের ব্যাপক উন্নয়ন করতে হবে। (৫) বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর সকল ক্যাম্প পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে পর্যায়ক্রমে তুলে নিতে হবে।

সরকার ইতিমধ্যেই অনেক দাবী মেনে নিয়েছে। পার্বত্য অঞ্চলের ব্যাপক উন্নয়ন সাধন, সাধারণ ক্ষমা, স্থানীয় সরকার পরিষদ গঠন, আঞ্চলিক বিষয়ে স্থানীয় সরকার পরিষদকে ক্ষমতা প্রদান, অ-উপজাতিদের জমির বন্দোবস্ত রহিতকরণসহ অনেক দাবী মেনে নেয়া হয়েছে। স্থানীয় সরকার পরিষদ গঠন হবার পর থেকে পার্বত্য জনগণ প্রায় স্বশাসিত প্রতিরক্ষা, অর্থ ও পররাষ্ট্রনীতি ছাড়া সব কিছুই স্থানীয় সরকার পরিষদের হাতে ন্যস্ত করা হয়েছে। কিন্তু ষড়যন্ত্রকারী শান্তিবাহিনী শুরু থেকেই এ স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার বিরোধিতা করে আসছে। আর তা নস্যাৎ করার জন্য সন্ত্রাসী তৎপরতা অব্যাহত রেখেছে। পাশাপাশি পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ ও পাহাড়ী গণপরিষদ নামে ২টি সংগঠন বিভিন্ন বিরূপ প্রচারণায় লিপ্ত রয়েছে।

সম্প্রতি পার্বত্য অঞ্চল সফরকালে স্থানীয় সরকার পরিষদের চেয়ারম্যান এবং পরিষদ সদস্যদের সাথে আলাপ করে জানা গেছে, পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ স্থানীয় সরকার পরিষদ থেকে

বৃত্তির টাকা, কল্যাণ ভাতাসহ যাবতীয় সুযোগ সুবিধা ভোগ করছে। ভোগ করছে স্থানীয় সরকার পরিষদের সুফল। তারপরও তারা স্থানীয় সরকার পরিষদের বিরুদ্ধে প্রচারণা চালাচ্ছে।

পার্বত্য অঞ্চলে ৮দিন অবস্থানকালে স্থানীয় একটি সূত্র জানায়,· সরকারের পক্ষ হতে জনসংহতি সমিতির সাথে নতুন করে যে বৈঠকের কথা বলা হয়েছে, তাতে স্থানীয় সরকার পরিষদসমূহের সম্মতি রয়েছে। তারা অনুষ্ঠিতব্য এ বৈঠকে তাদের অংশগ্রহণের দাবী করেছে। জনসংহতি সমিতিরও এ ব্যাপারে কোন আপত্তি নেই বলে সূত্রটি জানায়।

*Looking forward to bid farewell to disquiet in Chittagong Hill Tracts are from the Left Mr. Shaching Prue Jeri, Babu Samiran Dewan and Babu Gautam Dewan, Chairman of Bandarban, Khagrachari and Rangamati Local Govt Council respectively. The leaders are seen attending a two-day peace conference in Rangamati (Nov. 4-5, 1991)*

# ভারত সন্ত্রাসীদের আশ্রয়, প্রশিক্ষণ ও অস্ত্র সরবরাহ করছে

ভারত সন্ত্রাসীদের আশ্রয়, প্রশিক্ষণ, অস্ত্র এবং গোলাবারুদ সরবরাহ করে পার্বত্য চট্টগ্রামে সন্ত্রাস লালন করছে। সন্ত্রাসীদের চূড়ান্ত বিজয় নয় শুধুমাত্র সমস্যাটিকে জিইয়ে রেখে বাংলাদেশের উন্নয়নকে ব্যাহত করাই হচ্ছে ভারতের উদ্দেশ্য।

সম্প্রতি সাধারণ ক্ষমা ঘোষণার সুযোগে আত্মসমর্পণকারী শান্তিবাহিনীর সদস্যরা এ সব তথ্য প্রকাশ করেছে। তাদের অভিমত হচ্ছেঃ গত ১৭ বছরে ভারত শান্তিবাহিনীকে কখনও অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে বড় ধরনের কোন সাহায্য করেনি। সাহায্য সহযোগিতার মাত্রা থেকেই বিষয়টি আজ সুস্পষ্ট।

গত ৫মে খাগড়াছড়িতে আত্মসমর্পণকারী শান্তিবাহিনীর কয়েকজন সদস্যের সঙ্গে এই প্রতিনিধির আলাপ হয়। তাদের সকলেই জানায়, ভারতের মিজোরাম ও ত্রিপুরায় শান্তিবাহিনীর সদস্যদের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। কিন্তু বর্তমানে শান্তিবাহিনীর সদস্যরা মানসিকভাবে ভেঙ্গে পড়েছে। ভারত যে তাদেরকে ব্যবহার করে ফায়দা লুটছে তা তারা বুঝতে সক্ষম হয়েছে। এ কারণে অনেক সদস্য আত্মসমর্পণ করছে। বর্তমানে যারা রয়েছে, তাদের সংখ্যা ৩ থেকে ৪ হাজারের বেশী নয়। আলাপকারীদের মধ্যে কেউ শান্তিবাহিনীতে পাঁচ, কেউ সাত, কেউ ১৫ বছর পর্যন্ত ছিল। সকলেই তাদের ভুল বুঝতে পেরে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে এসেছে। এখনও অনেকে আসতে চায়। কিন্তু ভারতীয় বি এম এফ বাধা দিচ্ছে বলে তারা জানায়।

অপরদিকে, শান্তিবাহিনী প্ররোচিত হয়ে মানবাধিকার সংস্থার মাধ্যমে ভারত এবং ইউরোপের কয়েকটি শহরে প্রচারণা কোষ পরিচালনা করছে। পার্বত্য চট্টগ্রামে তথাকথিত মানবাধিকার লংঘন, জাতিসত্তা ধ্বংস, জোর করে মুসলমান বানানোসহ নানা মিথ্যা প্রচারণার মাধ্যমে ইউরোপীয় কিছু দেশসহ মানবাধিকার সংরক্ষণ সংস্থার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে তারা সক্ষম হয়েছে। পাশাপাশি দেশের অভ্যন্তরে শান্তিবাহিনীর প্রকাশ্য সংগঠন পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ ও গণ-সংহতি পরিষদ এবং তথাকথিত এক শ্রেণীর বুদ্ধিজীবী পার্বত্য অঞ্চলের বিরাজমান সমস্যা সম্পর্কে মিথ্যা প্রচারণায় লিপ্ত রয়েছে।

পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ বিগত স্বৈরাচারী সরকারের সময় ভারতের এক শ্রেণীর পত্র পত্রিকায় মিথ্যা বানোয়াট তথ্য প্রচার করে ফায়দা লুটার চেষ্টা করেছিল। তারাই আজ গণতান্ত্রিক পরিবেশের সুযোগ নিয়ে দেশের মধ্যে প্রচারণা শুরু করে। তাদের প্রকাশিত প্রচারপত্রে কখনও শান্তিবাহিনীর নৃশংসতার সমালোচনা থাকে না। তারা সভা-সমাবেশ ও সেমিনার করে বিশেষ একটি গোষ্ঠীকে আমন্ত্রণ জানায়। পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের নেতৃবৃন্দ দেশের সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠে অধ্যয়ন করেও আন্তর্জাতিক বিশ্বের কোন উদাহরণ তারা গ্রহণ করে না। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের ক্ষুদে জাতিসত্তার উপর অত্যাচার নিপীড়নের ইতিহাসের তুলনায় জনগোষ্ঠীর মাত্র ৪৫ ভাগ

হয়েও বাংলাদেশ সরকারের দেয়া সুযোগ সুবিধার কথা তারা মুক্তভাবে চিন্তা করছে না। কোন আলোচনায় আহবান করলে তাদের খুঁজে পাওয়া যায় ন।।

সম্প্রতি খাগড়াছড়ি, বান্দরবান ও রাঙামাটি সফরকালে এ সব এলাকার সর্বস্তরের মানুষের সাথে এই প্রতিনিধি খোলামেলা আলোচনা করেন। কিন্তু পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের কাউকে আলাপ করার জন্য খুঁজেও পাওয়া যায়নি। কেউ নিজ উদ্যোগে আলাপ করতেও আসেনি।

ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার প্রবল চাপ, বন্যার তান্ডব, অতি খরা, শিক্ষা ও কর্মসংস্থানের অপ্রতুলতা, শিল্পায়নে অনগ্রসরতা সর্বোপরি দারিদ্রতার অভিশাপে বাংলাদেশ যখন জর্জরিত তখন পার্বত্য অঞ্চলে বয়ে যাচ্ছে উন্নয়নের বন্যা। অথচ পার্বত্য অঞ্চল কখনও বন্যার সম্মুখীন হয় না, সবুজ শ্যামল পার্বত্য মাটি কখনও হয় না খরায় চৌচির। তারপরও বিশেষ সুবিধাভোগী চাকমা সম্প্রদায়টির একটি উল্লেখযোগ্য অংশ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করে মনগড়া বিবৃতি ও লিফলেট ছেড়ে বিশ্ববাসীকে বিভ্রান্ত করার অপচেষ্টায় লিপ্ত।

পার্বত্য অঞ্চলের আধা বাংলা ভাষাভাষী অ-উপজাতীয়দের সাথে মুক্ত আলোচনায় সকলেই প্রশ্ন রেখেছেন, সমতল ভূমি বা তারা কেউ রাষ্ট্রদ্রোহীতামূলক কোন প্রচারপত্র বিতরণ বা বক্তব্য বিবৃতি প্রচার করলে তাকে রাষ্ট্রদ্রোহীতার অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়। ব্যবস্থা নেয়া হয় আইনগত। কিন্তু পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ একের পর এক রাষ্ট্রদ্রোহীতামূলক ও উস্কানিমূলক বক্তব্য দিচ্ছে; সরকার সে ব্যাপারে কোন উচ্চবাচ্য করছেনা। তারা বলেনঃ একই দেশে দুই আইন চলতে পারে না। পাহাড়ীদের প্রতি একের পর এক উদারতা প্রদর্শন ও নমনীয়তাকে তারা লাইসেন্স বলে ধরে নিয়েছে।

আলাপ হয় খাগড়াছড়ি কলেজের প্রথম বর্ষের ছাত্র রুহুল আমীনের সাথে। তার ক্ষোভ সরকারের বিরুদ্ধে। পাহাড়ী ছাত্ররা সব সময় সরকারকে বেকায়দায় ফেলার চেষ্টা করে। অথচ সরকার তাদের থাকার জন্য হোস্টেল নির্মাণ থেকে শুরু করে চাকরিতে কোটা, বৃত্তি প্রদান, বিনোদনের ব্যবস্থাসহ যাবতীয় ব্যবস্থা করে দিয়েছে। অথচ পাহাড়ে অবস্থানরত বাংলা ভাষাভাষীদের প্রশ্নে সরকার পক্ষপাতমূলক আচরণ করছে। রুহুল আমিন জানায়, এস এস সি পর্যন্ত মানুষের বাড়ী লজিং থেকে পড়াশুনা করেছে। বর্তমানে অনেক দূর থেকে পায়ে হেঁটে কলেজে আসে। কিন্তু কলেজে হোস্টেলের ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও তার কোন সীট নেই। উপজাতিরাই হোস্টেলে থাকছে। পার্বত্য চট্টগ্রামে অবস্থানকালে এই প্রতিনিধি বাংলা ভাষাভাষীদের মনে চাপা ক্ষোভ দেখতে পান। তাদের অভিমতঃ উপজাতিদের জন্য সরকার এতসব করার পরও তারা অকৃতজ্ঞ। দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের বিরুদ্ধে তাদের ষড়যন্ত্র অব্যাহতরয়েছে।

# উন্নয়নের ধারা অব্যাহত থাকলে সন্ত্রাসের অবসান অবশ্যম্ভাবী

গহীন অরণ্যে উঁচু-নীচু পর্বতমালায় মশার কামড় ও ঝি ঝি পোকার ডাক। তারই মাঝে পাহাড়ের চূড়ায় রয়েছে সেনা বাহিনীর ক্যাম্প। যেখান থেকে তারা দেশের অখন্ডতা রক্ষার্থে অতন্দ্র প্রহরী হয়ে কর্তব্য পালন করছে। শান্তিবাহিনীর তৎপরতার প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রেখে চলেছে। প্রতিদিন ৫শ' কিলোমিটার রাস্তা পাহারা দিচ্ছে। নিয়মিত পরীক্ষা করছে শান্তিবাহিনী রাস্তায় কোন মাইন বা বিস্ফোরক পুঁতে রেখেছে কিনা। এছাড়া সীমান্তের কাছাকাছি আরো অনেক দুর্গম পাহাড়ের উপর রয়েছে সেনাছাউনি। যেখানে সড়ক পথে বা পায়ে হেঁটে কোন রসদ পাঠানো যায় না। হেলিকপ্টারই একমাত্র মাধ্যম। স্বজনদের ছেড়ে সমতল ভূমির সুযোগ সুবিধা বিসর্জন দিয়ে মশার কামড় খেয়ে প্রতিদিন পার্বত্য অঞ্চলের গহীন অরণ্যে যারা দেশ সেবায় রত তাদের দুরবস্থার কথা চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা যাবে না।

ভাবতেও অবাক লাগে বিংশ শতাব্দীর এ যুগে প্রায় হাজার ফুট উঁচু পাহাড় থেকে পায়ে হেঁটে নেমে গহীন অরণ্যের মাঝে ছরায় গোসল সেরে আবার পানি সংগ্রহ করতে হয়। প্রতিদিন ১০ থেকে ১৫ মাইল উঁচু-নীচু পাহাড় বেয়ে শান্তিবাহিনীর আসার খবর পেয়ে টহলে বের হতে হয়। তারপর নিয়মিত টহল তো রয়েছেই। সামান্য ঝড় বাতাসেই পাহাড়ের চূড়ায় বানানো কাঠের ঘর নড়বড়ে হয়ে পড়ে। আবার তা ঠিক করে বাস করতে হয়। তারপর রয়েছে জোঁকের ভয়, রয়েছে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ, রয়েছে বন্য জন্তু হাতি পোকা। যে পোকা একবার তার "হুল" ঢুকাতে পারলে সাথে সাথেই শুরু হয় ম্যালেরিয়া জ্বর। সময়মত চিকিৎসার ব্যবস্থা না করা হলে ২৪ ঘন্টার মধ্যে অনেক ক্ষেত্রেই রোগীকে প্রাণ দিতে হয়। এক হিসাবে দেখা গেছে, এ পর্যন্ত নিরাপত্তা বাহিনীর প্রায় ১শ' সদস্য ম্যালেরিয়ায় মৃত্যুবরণ করেছে। মোদ্দাকথা নিরাপত্তা বাহিনী তার নিজস্ব রণকৌশল ও দেশীয় উপকরণ দিয়ে পার্বত্য অঞ্চলে সশস্ত্র শান্তিবাহিনীর তৎপরতা মোকাবিলা এবং শান্তিপ্রিয় পার্বত্যবাসীর জানমালের হেফাজতে যে পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে, তা কোন কোন ক্ষেত্রে উন্নত বিশ্বের ইনসারজেন্সী এলাকার সাথে তুলনা করা যায়।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন সময়ে জাতিগত ইনসারজেন্সী হয়েছে এবং হচ্ছে। সাধারণত একবার সন্ত্রাস দেখা দিলে তা সহজে প্রশমিত হয় না। ৫০-এর দশকে বিভিন্ন দেশে সশস্ত্র কমিউনিস্ট বিদ্রোহ দেখা দেয় যা পরবর্তীতে গেরিলা যুদ্ধে রূপ নেয়। মালয়েশিয়া ও থাইল্যান্ডের কমিউনিস্ট বিদ্রোহ, আয়ারল্যান্ডের জাতিগত বিদ্রোহের কথা স্মরণীয়। মালয়েশিয়া, থাইল্যান্ডে দীর্ঘদিন পর বিদ্রোহের পরিসমাপ্তি ঘটেছে। ভিয়েতনামে দীর্ঘ ২৫ বছর গেরিলা যুদ্ধের পর কমিউনিস্টরা বিজয়ী হয়েছে। প্রতিবেশী দেশ বার্মাতেও বহু জাতিগত বিরোধ রয়েছে। অর্থাৎ কোন দেশে সশস্ত্র জাতিগত বিদ্রোহ শুরু হলে তা সহজে শেষ হয় না। এক্ষেত্রে সন্ত্রাসীদের সশস্ত্র তৎপরতার বিরুদ্ধে প্রতিব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য প্রয়োজন

হয় নিরাপত্তা বাহিনীর জনসমর্থন। জয় করতে হয় তাদের মন। একদিকে যেমন সশস্ত্র সন্ত্রাসীদের চোরাগোপ্তা হামলা মোকাবিলা করতে হয়, অন্যদিকে ক্ষুব্ধ ও অসন্তুষ্ট জনগোষ্ঠীকে শান্ত করার লক্ষ্যে শুরু করতে হয় প্যাসিফিকেশন প্রোগ্রাম বা মৈত্রী কার্যক্রম। ভিয়েতনাম যুদ্ধের সময় মার্কিন বাহিনী একদিকে নাপাম বোমা ফেলে হাজার হাজার মানুষকে হত্যা করেছে। অন্যদিকে চালিয়েছে প্যাসিফিকেশন প্রোগ্রাম। কিন্তু এখানেই ছিল তাদের ভুল। ফলে এতে কোন কাজ হয়নি। এক্ষেত্রে পার্বত্য অঞ্চলে দেশের নিরাপত্তা বাহিনী শান্তিবাহিনীর চোরাগোপ্তা হামলার মোকাবিলায় পাল্টা সামরিক ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি। অধৈর্য হয়ে বেপরোয়াভাবে গুলীবর্ষণ না করে ধীরস্থিরভাবে বিভিন্ন জনহিতকর কার্যক্রমের মাধ্যমে উপ-জাতীয়দের শান্তকরণের কর্মসূচী পালন করেছে। যা আজ অনেকটা সফলতা লাভ করেছে। আস্থা অর্জন করতে পেরেছে উপজাতীয়দের। আগে যেখানে অনেক অর্থ এবং বিভিন্ন গোয়েন্দা কার্যক্রমের আওতায় উপজাতীয়দের কাছ থেকে শান্তিবাহিনীর অবস্থানের খবর সংগ্রহ করতে হতো, সেখানে আজ তারা স্বেচ্ছায় এসে খবর দিচ্ছে। বর্তমানে সীমান্তবর্তী উপজেলার কাছাকাছি ছাড়া পার্বত্য অঞ্চলে শান্তিবাহিনী তৎপরতা চালাতে ব্যর্থ হচ্ছে। কারণ লোকালয়ে আসলেই কোন না কোনভাবে নিরাপত্তা বাহিনীর কাছে খবর পৌঁছে যায়। বর্তমানে তারা লোকালয় আসলেও সামান্য সময়ের মধ্যে পুনরায় গহীন জঙ্গলে বা সীমান্তের ওপাড়ে চলে যায়।

পার্বত্য চট্টগ্রামের বর্তমান উন্নয়নের ধারা ও স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা এবং নিরাপত্তা বাহিনীর তৎপরতা ও মৈত্রী কার্যক্রম অব্যাহত থাকলে সন্ত্রাস যুদ্ধের স্বাভাবিক মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী।

সম্প্রতি পার্বত্য অঞ্চল সফরকালে নিরাপত্তা বাহিনীর মৈত্রী কর্মসূচী সম্পর্কে খোঁজ খবর নিয়ে দেখা গেছে, স্থানীয় পর্যায়ের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ সাংবাদিক, বুদ্ধিজীবীসহ সর্বস্তরের জনগণের সঙ্গে নিরাপত্তা বাহিনী সদস্যদের সু-সম্পর্ক বিদ্যমান। কোন ভিআইপি'র সম্মানে নিরাপত্তা বাহিনী নৈশভোজ বা মধ্যাহ্ন ভোজ বা কোন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজনকালে এলাকার উপজাতি, অ-উপজাতীয় নেতৃবৃন্দকে আমন্ত্রণ জানানো হয়। তবে পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন বিষয়ে যেমন, সঠিকভাবে গুচ্ছগ্রামের লোকেরা রেশন পাচ্ছে কিনা, কোন অনিয়ম রয়েছে কিনা কিংবা শান্তকরণ কর্মসূচী প্রকল্পের টাকা নিয়ে কোন দুর্নীতির অভিযোগ রয়েছে কিনা তা সংক্ষিপ্ত সফরে অনুধাবন করা সম্ভব ছিল না।

# পার্বত্য চট্টগ্রামের উন্নয়নে যা করা হয়েছে, যা করা হচ্ছে

পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে অবহেলিত, অনুন্নত ও দরিদ্র জনসাধারণের সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান ১৯৭৬ সনে এক অধ্যাদেশ বলে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড গঠন করেন। জন্মলগ্ন থেকে এ অঞ্চলের সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে শিক্ষা, কৃষি, যাতায়াত, সমাজকল্যাণ, কুটির শিল্প, ক্রীড়া ও সংস্কৃতি ইত্যাদিতে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করে আসছে। এ পর্যন্ত বোর্ড উপরোক্ত সেক্টরসমূহে প্রায় ৩৩ কোটি টাকা ব্যয়ে ৭৩২টি প্রকল্প সমাপ্ত করেছে এবং চলতি অর্থ বছরে আরও ৪২টি প্রকল্প বাস্তবায়ন করে চলেছে।

এছাড়া এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় ১৯৭৯-'৮০ আর্থিক সনে অত্র বোর্ড পার্বত্য চট্টগ্রাম বহুমুখী উন্নয়ন প্রকল্প নামে এক ব্যাপকতর কর্মসূচী হাতে নেয়। এ বহুমুখী প্রকল্পের আওতাধীনে রয়েছে ১১টি খাত। (১) ভূমিহীন জুমিয়া পরিবারদের পুনর্বাসনের জন্য উচ্চভূমি বন্দোবস্তীকরণ প্রকল্প, (২) খাগড়াছড়ি যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে রোড নেটওয়ার্ক প্রকল্প, (৩) পার্বত্য অঞ্চলে কৃষি গবেষণা কেন্দ্র স্থাপনে কৃষি গবেষণা প্রকল্প, (৪) কৃষি উন্নয়নে কৃষি সম্প্রসারণ প্রকল্প, (৫) নার্সারী উন্নয়নে নার্সারী উন্নয়ন প্রকল্প, (৬) কুটির শিল্প প্রকল্প, (৭) পরিবার পরিকল্পনা প্রকল্প, (৮) স্বাস্থ্য প্রকল্প, (৯) কৃষিজাত দ্রব্যাদি গুদামজাতকরণের সুবিধার্থে গুদাম নির্মাণ প্রকল্প, (১০) বন উন্নয়নের লক্ষ্যে বনায়ন ও পুনর্বাসন প্রকল্প এবং (১১) উল্লেখিত প্রকল্পসমূহের পূর্ত কাজ বাস্তবায়নে সহায়তার জন্য লোকবল সৃষ্টির মাধ্যমে বোর্ডের শক্তিশালীকরণ প্রকল্প রয়েছে।

এ ১১টি প্রকল্পের মোট অনুমোদিত টাকার পরিমাণ প্রায় ১৪ হাজার কোটি। তন্মধ্যে এডিবি সাহায্যাংশ ৮৬১৯·৪৪ লক্ষ এবং সরকারী অনুদান ৫১৮০·৯৫ লক্ষ টাকা। উল্লেখ্য যে, এ ১১টি প্রকল্পের মধ্যে উচ্চভূমি বন্দোবস্তীকরণ প্রকল্প বোর্ডের মাধ্যমে সরাসরি বাস্তবায়িত হচ্ছে এবং শক্তিশালীকরণ প্রকল্প অত্র বোর্ডের মাধ্যমে সমাপ্ত হয়েছে। অবশিষ্ট ৯টি প্রকল্পের মধ্যে ৮টি প্রকল্প সংশ্লিষ্ট বিভাগ ও সংস্থার মাধ্যমে বিগত ১৯৮৮-৮৯ ইং আর্থিক সনে সমাপ্ত হয়েছে এবং ১টি প্রকল্প, যথা-রোড নেটওয়ার্ক প্রকল্প সড়ক ও জনপথ বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ ৯টি প্রকল্পের পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড শুধুমাত্র সমন্বয়কারী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছে এবং করছে।

উচ্চভূমি বন্দোবস্তীকরণ প্রকল্পের আওতাধীনে চেংগী, মাইনী ও কাচালং উপত্যকায় মোট ২০০০ ভূমিহীন জুমিয়া পরিবারকে পুনর্বাসন করা হয়েছে। তাদের জন্য প্রতি পরিবারে ৬·২৫ একর হিসেবে মোট ১২,৫০০ একর জমি বিতরণের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। প্রতি পরিবারে ৬·২৫ একরের মধ্যে ০·২৫ একরে বাসস্থান, ২·০০ একরে উদ্যান বাগান এবং ৪·০০ একরে রাবার বাগান করা হয়েছে। উল্লেখিত ২০০০ ভূমিহীন জুমিয়া পরিবারের জন্য সর্বমোট ৮০০০ একর

রাবার বাগান সৃষ্টি করা হয়েছে। তাদের সামাজিক সুবিধার্থে গৃহ নির্মাণ, স্কুল, উপশনালয়, পানীয়জল ও পয়ঃ প্রণালীর ব্যবস্থা করা হয়েছে। রাবার বাগান হতে উৎপাদিত কষ প্রক্রিয়াজাতকরণের জন্য প্রকল্প এলাকায় ছোট-বড় মোট ৪টি রাবার কারখানা স্থাপন করা হয়েছে। অনতিবিলম্বে রাবার কষ আহরণ ও প্রক্রিয়াজাতকরণের কাজ হাতে নেয়া হবে। বর্ণিত রাবার কারখানাগুলো একটি কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপনা ইউনিটের মাধ্যমে পরিচালিত হবে, তথায় জুমিয়া পুনর্বাসিত পরিবারের প্রতিনিধিও জড়িত থাকবে। রাবার কষ আহরণ ও প্রক্রিয়াজাতকরণের মাধ্যমে রাবার বিক্রি শুরু হলে পুনর্বাসিত পরিবারগুলো আয় পেতে শুরু করবে। এ প্রকল্প জুন '৯৩-তে শেষ হবে।

রোড নেটওয়ার্ক প্রকল্পের আওতাধীনে খাগড়াছড়ি-পানছড়ি রাস্তা, দীঘিনালা-বাবুছড়া রাস্তা, দীঘিনালা-ছোটমেরুং রাস্তা এবং দীঘিনালা-বাঘাইছড়ি রাস্তা করার কাজ হাতে নেয়া হয় এবং বর্তমানে এ কাজগুলো সমাপ্তির পথে। আগামী জুন '৯২ তে এ প্রকল্পের কাজ সম্পূর্ণরূপে সমাপ্ত হবে।

অধিকন্তু, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান পার্বত্য জেলায় ইউনিসেফের আর্থিক সাহায্যে সমন্বিত সমাজ উন্নয়ন প্রকল্পের আওতাধীনে উপজাতীয়দের আয় বর্ধনের লক্ষ্যে ও তাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ১৯৮২-'৮৩ ইং আর্থিক সন হতে মোট ৭৫ টি মৌজায় ইউনিসেফ প্রকল্প চালু রেখেছে। তাছাড়া অত্র বোর্ড বিশেষ পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনায় ১৯৮৪-'৮৫ ইং আর্থিক সন থেকে বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলায় ২০ টি বিভিন্ন বিভাগ ও সংস্থার কার্যক্রম সমন্বয় সাধন সহকারে জুমিয়া পুনর্বাসন নামে একটি প্রকল্পও সমাপ্ত করেছে।
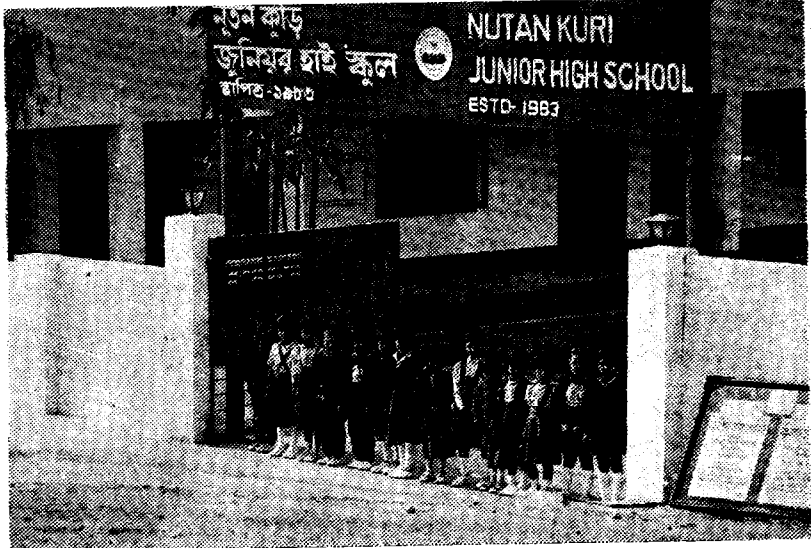
*A school in a hill district. Such an academic atmosphere could not be though of by the tribals even in the recent past.*

# পার্বত্য চট্টগ্রামের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

রাঙ্গামাটি, বান্দরবান ও খাগড়াছড়ি এ তিনটি পার্বত্য জেলা নিয়েই গঠিত হয়েছে বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রাম। এর সর্বমোট আয়তন ৫১৩৮ বর্গমাইল যেটা বাংলাদেশের আয়তনের ১০ ভাগের ১ ভাগ। জনসংখ্যা আনুমানিক ৮ লক্ষ যেটা বাংলাদেশের জনসংখ্যার প্রায় ২০০ ভাগের ১ ভাগ। পার্বত্য চট্টগ্রাম প্রকৃত অর্থেই পর্বতসংকুল। কয়েকটি বড় বড় উপত্যকা আছে যথা চেংগী, মাইনি, কর্ণফুলী, মাতামুহুরী এবং সাংগু উপত্যকা।

পার্বত্য চট্টগ্রামে ১৩টি উপজাতির বাস। বাংলাদেশের মূল জনগোষ্ঠীর সাথে পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতিদের গোষ্ঠীগত উৎপত্তি (এথ্‌নিক অরিজিন)–এর তফাৎ আছে। পার্বত্য চট্টগ্রামে ১৩টি উপজাতির নাম এবং উপজাতীয়দের প্রত্যেকটির শতকরা অংশ নিম্নরূপ ঃ (ক) চাকমা ৫০·৫০%, (খ) মারমা ২৭·৪০%, (গ) ত্রিপুরা ১২·২০%, (ঘ) তংচইংগা, (ঙ) রিয়াং, (চ) ম্রো, (ছ) লুসাই, (জ) পাংখু, (ঝ) বোম, (ঞ) চাখ, (ট) খুমি, (ঠ) উসাই, (ড) খিয়াং –সব মিলিয়ে ৯ দশমিক ৫০ ভাগ।

১৭৬০ খৃষ্টাব্দে তৎকালীন বংগের মোগল গভর্নর মীর কাশেম আলী খান চট্টগ্রাম জেলাটিকে বৃটিশদের নিকট অর্পণ করেন। ১৮৬০ সালে তৎকালীন চট্টগ্রাম জেলার পূর্ব অংশে অবস্থিত পার্বত্য এলাকা নিয়ে গঠিত হয় পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলা।

১৯০০ সালে একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক পদক্ষেপ নেয়া হয় যথা ঃ "দি চিটাগাং হিল ট্রেক্‌টস রেগুলেশন (রেগুলেশন ওয়ান অব ১৯০০)" নামক এক আইন জারি করা হয়। এই রেগুলেশন, রুলস ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিধি, প্রবিধি, আদেশ ইত্যাদিকে "হিল ট্রেক্‌টস ম্যানুয়াল" বলা হয়। হিল ট্রেক্‌টস ম্যানুয়াল মোতাবেকই পার্বত্য চট্টগ্রাম প্রশাসিত হতে থাকে। এই ম্যানুয়াল মোতাবেক সমগ্র পার্বত্য চট্টগ্রামকে বিভিন্ন এলাকা ও ভিন্ন ভিন্ন উপজাতীয়গণের আবাসের ভিত্তিতে তিনটি সার্কেলে ভাগ করা হয়। এগুলো হল– চাকমা সার্কেল (সদর দপ্তর রাঙ্গামাটি), বোমাং সার্কেল (সদর দপ্তর বান্দরবান) ও মং সার্কেল (সদর দপ্তর মানিকছড়ি)।

সার্কেলের প্রধানকে চীফ বা সাধারণ মানুষের ভাষায় রাজা বলা হয়। সরকার কর্তৃক নিয়োজিত জেলা ও মহকুমা প্রশাসকগণ প্রশাসন পরিচালনা করলেও, সার্কেল চীফগণের একটা ভূমিকা বরাবরই ছিলো। যেহেতু বৃটিশ আমলে "বংগ প্রদেশ"–এর ভৌগোলিক সীমানার মধ্যে থেকেও একটা ভিন্নতর আইন দ্বারা পার্বত্য চট্টগ্রাম প্রশাসিত হতো, সেহেতু এটাকে "নন–রেগুলেটেড" জেলা বলা হতো। বৃটিশ সাম্রাজ্যের বিবিধ সীমান্তবর্তী অঞ্চলে এরূপ "নন রেগুলেটেড" এলাকা একাধিক ছিলো এরূপ বন্দোবস্ত ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত চলে।

১৯৪০–১৯৪৭ সাল পর্যন্ত সময় হচ্ছে তৎকালীন বৃটিশ ভারতে স্বাধীনতা সংগ্রামের শেষ পর্ব। পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংখ্যায় বেশী, লেখাপড়ায় অগ্রগামী ও অর্থনৈতিকভাবে বেশী প্রতিষ্ঠিত এবং সামাজিকভাবে অধিকতর সংগঠিত হওয়ার কারণে ঐসময়কার রাজনৈতিক তৎপরতায় চাকমা উপজাতীয় নেতৃবৃন্দের ভীষণ প্রাধান্য ছিলো। ঐসকল উপজাতীয় নেতৃবৃন্দের মধ্যে বেশ

কিছু নেতৃবৃন্দ পার্বত্য চট্টগ্রামকে ভারতের অন্তর্ভুক্ত করার চেষ্টা চালায় এবং কংগ্রেসও একে সমর্থন করে। কিন্তু মুসলিম লীগের দাবীর পরিপ্রেক্ষিতে ও অন্যান্য কারণে পার্বত্য চট্টগ্রাম তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হয়। অনেক উপজাতীয় নেতৃবৃন্দ এতে নাখোশ হয়ে প্রথমে বিদ্রোহ করেন ও পরবর্তীতে ভারতে পালিয়ে যায়। এই ঘটনার কারণে ১৯৪৭-এর পরবর্তী তৎকালীন পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার ও তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের প্রাদেশিক সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামের দিকে সন্দেহের চোখে তাকাতো।

১৯৪৭ সালের পরেও মোটামুটিভাবে, হিল ট্রেক্টস ম্যানুয়ালকে মান্য করে পার্বত্য চট্টগ্রাম প্রশাসিত হতে থাকে। ১৯৫৬ সালে প্রবর্তিত পাকিস্তানের সংবিধানে পার্বত্য চট্টগ্রামকে "এক্সক্লুডেড এরিয়া"-এর মর্যাদা দেয়া হয়। ১৯৬২-এর সংবিধানে এ মর্যাদা বদলিয়ে "ট্রাইবাল এরিয়া" বলে চিহ্নিত করা হয়। ১৯৪৭ থেকে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত সময়কালে হিল ট্রেক্টস ম্যানুয়ালে বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সংশোধনী আনা হয়।

১৯৬২ সালে 'কাপ্তাই জলবিদ্যুৎ প্রকল্প' চালু হলে কাপ্তাইর উজানে কর্ণফুলী নদীর একটা বিরাট অংশ জলমগ্ন হয়ে যায়। প্রায় ৩৪০ বর্গমাইল আয়তনের এই লেক সৃষ্টির কারণে প্রায় ১ লক্ষ উপজাতি উপদ্রুত হয়ে বাস্তুভিটা ত্যাগ করতে বাধ্য হয়। তৎকালীন পাকিস্তান সরকার তাদের উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দেয়নি এবং উপদ্রুত জনগণকে সুষ্ঠু ও সংগঠিতভাবে পুনর্বাসন করেনি। প্রসংগত উল্লেখ্য যে, কাপ্তাই লেকে নিমজ্জিত অংশই ছিলো খাদ্যশস্য উৎপাদনের জন্য বিখ্যাত। লেক সৃষ্টির কারণে এবং পুনর্বাসনে সরকারের অবহেলার কারণে উপজাতীয় জনগণ তৎকালীন পাকিস্তান সরকারের প্রতি বিতৃষ্ণ হয়। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে এই যে, ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় মুষ্টিমেয় উপজাতি মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করে। তিনজন রাজার মধ্যে শুধুমাত্র মানিকছড়ির রাজা মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। উপজাতীয়রা ব্যাপকহারে রাজাকার বাহিনীতে যোগ দেয়। ১৬ই ডিসেম্বর ১৯৭১-এ বিজয়ের প্রাক্কালে চাকমা সার্কেলের চীফ রাজা ত্রিদিব রায় পাকিস্তানে পালিয়ে যান।

# উপজাতীয় জনগোষ্ঠীর রাজনৈতিক তৎপরতা

১৯৬২ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত উপজাতীয় ছাত্ররা "ট্রাইবাল স্টুডেন্টস ইউনিয়ন" গঠন করে। পরবর্তীতে, রাঙ্গামাটি শহরে রাঙ্গামাটি কলেজ স্থাপনের পর এটা হয়ে উঠে উপজাতীয় ছাত্র রাজনীতির প্রাণকেন্দ্র। তৎকালে উপজাতীয় ছাত্র রাজনীতির মূল লক্ষ্য ছিলো উপজাতীয় সংস্কৃতি রক্ষা ও বিকাশ, শিক্ষা ও চাকুরিতে উপজাতীয়দের স্বার্থ রক্ষা ও উন্নয়ন, উপদ্রুত জনগোষ্ঠীর পুনর্বাসন, হিল ট্রেক্টস ম্যানুয়ালের সংশোধন রহিত ও তার সঠিক বাস্তবায়ন ইত্যাদি। তৎকালের উপজাতীয় ছাত্র নেতাদের মধ্যে প্রখ্যাত ছিলেন মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা, জ্যোতিন্দ্রিয় বুদ্ধি প্রিয় লারমা, জ্যোতিন্দ্রলাল ত্রিপুরা, পংকজ কুমার দেওয়ান প্রমুখ।

১৯৭০ সালের মে মাসে রাঙ্গামাটি শহরে রাঙ্গামাটি কমিউনিস্ট পার্টি নামে একটি দল গঠনের প্রচেষ্টা হয়। ১৯৭০ সালের নির্বাচনে মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা প্রাদেশিক পরিষদ সদস্য নির্বাচিত হন।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভের অব্যবহিত পরে ১৯৭২ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার নেতৃত্বে একটি উপজাতীয় প্রতিনিধিদল দেশের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবর রহমানের সংগে দেখা করেন ও একটি স্মারকলিপি পেশ করেন, যার মূল দাবী ছিলোঃ (ক) পার্বত্য চট্টগ্রামের জন্য নিজস্ব আইন পরিষদসহ স্বায়ত্তশাসন, (খ) ১৯০০ সালের রেগুলেশনকে বাংলাদেশের শাসনতন্ত্রে অন্তর্ভুক্তকরণ, (গ) পার্বত্য চট্টগ্রাম সংশ্লিষ্ট কোন পরিবর্তন যেন বাংলাদেশের সংবিধানে না আনা হয় তার সাংবিধানিক বন্দোবস্তকরণ এবং (ঘ) ট্রাইবাল চীফের অফিস ও ধারা সংরক্ষণ।

যতটুকু জানা যায়, প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিব তাদের দাবী দাওয়া মানার বদলে তাদের ধমক দিয়ে বিদায় করেন এবং বলেন, বাংলাদেশে উপজাতি বলে কিছু থাকবে না। এদেশে সবাই বাঙালী।

১৯৭২ সালের মে মাসে রাঙ্গামাটিতে এক জনসভার মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি নামক একটি দল গঠন করা হয়, যার প্রধান হন মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা। এই দল প্রকাশ্যভাবে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক দাবী দাওয়া আদায়ের লক্ষ্যে প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখে। ১৯৭৩ সালের জানুয়ারী মাসে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি তাদের সশস্ত্র শাখা সংগঠিত করে এবং এটাই পরবর্তীতে শান্তিবাহিনী নামে পরিচিত হয়। ১৯৭৩ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা সংসদ সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হন।

১৯৭৫ সালে সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনীর মাধ্যমে বহুদলীয় গণতন্ত্রের কবর রচনা করে যখন 'বাকশাল' নামক একটি 'রাজনৈতিক দল' গঠিত হয়, তখন মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা ঐ দলে যোগ দেন। তিনি একই সঙ্গে সাংবিধানিক–রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রামের দাবী দাওয়া আদায়ের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখার পাশাপাশি গোপনে জনসংহতি সমিতি নামক দল ও তার সশস্ত্র শাখা শান্তিবাহিনীকে সুসংগঠিত করতে থাকেন। ১৯৭৫–এর আগষ্টে সরকার পরিবর্তনের পর মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমাসহ জনসংহতি সমিতি নামক দলটি অপ্রকাশ্য বা গোপন হয়ে যায় এবং কয়েক মাসের মধ্যেই তারা বাংলাদেশের বিরুদ্ধে সশস্ত্র ও সহিংস কার্যকলাপ শুরু করে।
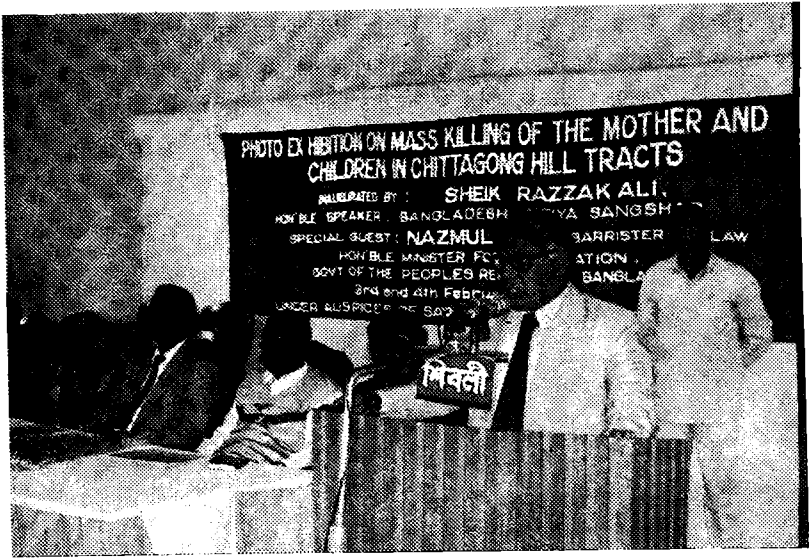
*Sk. Rajjak Ali, speaker of the Jatiyo Sangsad, speaking at the inaugural ceremony of a photo-exhibition on mass killings of the mother and children in Chittagong Hill Tracts.*

# বাংগালী বসতি স্থাপন প্রসংগে

উপজাতীয়রা যতই বাংলাভাষীদের 'বহিরাগত' বলুক না কেন, বস্তুতঃ পার্বত্য চট্টগ্রামে বাংলাভাষীরা বহু শতাব্দী আগে থেকেই বসবাস করছে, তবে এদের সংখ্যা তখন কম ছিলো। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে স্বাভাবিকভাবেই তাদের সংখ্যাও বৃদ্ধি পেতে থাকে। কাপ্তাই জলবিদ্যুৎ প্রকল্প, চন্দ্রঘোনা কাগজকলসহ পার্বত্য অঞ্চলের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড, অবস্থাসম্পন্ন উপজাতিগণের জমি চাষাবাদ ইত্যাদি প্রয়োজনে শ্রমিকের চাহিদা এবং চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রামের মধ্যে ব্যবসায়িক লেনদেনে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গের আসা যাওয়া ইত্যাদি কারণে স্বাভাবিকভাবেই বাংলাভাষী বসতি বৃদ্ধি পায়।

১৯৭৯–'৮২/'৮৩ সালে বাংলাদেশ সরকারের অনুমতিক্রমে পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন জায়গায় মূলতঃ খাস জমিতে কয়েক হাজার সমতলবাসী পরিবারকে পুনর্বাসিত করা হয়। এরা হচ্ছে মূলতঃ বাংলাদেশের সমতল এলাকার দরিদ্র ও ভূমিহীন জনগোষ্ঠী। কিন্তু পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি তথা শান্তিবাহিনী এ দরিদ্র জনগোষ্ঠির পুনর্বাসন পছন্দ করেনি। বস্তুতঃ পার্বত্য চট্টগ্রামে বাংলাভাষীদের সংখ্যা বৃদ্ধির ভালো ও মন্দ উভয় প্রকারের প্রভাব পড়ে। সরকার মন্দ প্রভাবগুলো কাটিয়ে ওঠার জন্য বিবিধ পদক্ষেপ বহু বছর ধরে নিয়ে আসছে। কিন্তু শান্তিবাহিনী কোনোভাবেই এটা মানতে রাজী নয়। তাদের দাবী হচ্ছে, পুনর্বাসন বন্ধ করা এবং ইতিমধ্যে পুনর্বাসিত পরিবারসমূহকে সমতল ভূমিতে ফেরৎ নিয়ে যাওয়া। এদের দাবীর পেক্ষিতে সরকার ১৯৮৩ সাল থেকে নতুন করে কোন পরিবারকে বসতি স্থাপনের অনুমতি প্রদান করেনি। তবে, সরকার সংশ্লিষ্ট সকল মহলকে জানিয়েছেন যে, বিভিন্ন কারণে ও পরিস্থিতিতে পুনর্বাসিতদের ফেরৎ নেয়া আর সম্ভব নয়।

# শান্তিবাহিনীর সহিংসতার রূপ

শান্তিবাহিনী বাংলাদেশ সরকার ও বাংলাদেশের বিরুদ্ধে সশস্ত্র আন্দোলন করছে ১৯৭৫ সাল থেকে। তারা সেনাবাহিনী, বিডিআর, পুলিশ, আনসার ইত্যাদির অবস্থান বা ভ্রাম্যমাণ দলের উপর হামলা করতো বা করে। শান্তিবাহিনীর হিংস্রতার নগ্নতম রূপ হচ্ছে অতর্কিতে রাত্রে বা দিনে নিরীহ বাংলাভাষীদের গ্রামে হামলা করা, ঘরবাড়ী আগুনে পুড়িয়ে দেয়া এবং অগ্নিদগ্ধ করে বা নির্বিচারে গুলীবিদ্ধ করে শত শত বাংলাভাষী মানুষকে হতাহত করা। ১৯৭৫ সাল থেকে নিয়ে এপর্যন্ত পানছড়ি, তাইনদং, কাউখালী, মেরুং, খাগড়াছড়ি, মাটিরাংগা, ভূষণছড়া ইত্যাদি এলাকায় শান্তিবাহিনী কয়েক হাজার পুনর্বাসিত পরিবারকে হতাহত করেছে।

অবশ্য শান্তিবাহিনীর অত্যাচার শুধুমাত্র বাংলাভাষীদের উপরই সীমাবদ্ধ নয়। তারা শত শত শান্তিকামী উপজাতীয় পরিবারের ঘরবাড়ীও পুড়িয়ে দিয়েছে, শতাধিক শান্তিপ্রিয় দেশপ্রেমিক গণ্যমান্য উপজাতীয় ব্যক্তিবর্গকে হত্যা ও অপহরণ করেছে। এমনকি, ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যে বাংলাদেশ সীমান্তের অপর পাড়ে অবস্থিত উপজাতীয়গণের শরণার্থী শিবিরে উপজাতীয় জনগণের উপরই বিভিন্ন দুনীতি, নির্যাতন ও নিষ্ঠুরতা চালিয়ে যাচ্ছে।

বাংলাদেশ সরকার বিভিন্ন সময়ে পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি স্থাপনের লক্ষ্যে বিভিন্ন রাজনৈতিক, আর্থ-সামাজিক ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। এমনকি জনসংহতি সমিতির সংগে মুখোমুখি আলোচনারও ব্যবস্থাও করেছে। কিন্তু জনসংহতি সমিতির অনমনীয় দৃষ্টিভংগী এবং দূরদৃষ্টির অভাবে এ সমস্ত আলোচনা ব্যর্থ হয়।

যা হোক ১৯৮৯ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে তৎকালীন জাতীয় সংসদে স্থানীয় সরকার পরিষদ বিল পাস এবং সে অনুযায়ী জুন মাসে বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রামে নির্বাচন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে প্রভূত ক্ষমতাসম্পন্ন জেলা পরিষদ গঠিত হলে এ অঞ্চলের ইতিহাসে এক নতুন যুগের সূচনা হয় এবং তথাকথিত শান্তিবাহিনী আক্ষরিক অর্থেই পাহাড়ী জনগণের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।

তবে তাই বলে তারা তাদের ঘৃণ্য তৎপরতা থেকে বিরত থাকেনি। জনসমর্থন থেকে বঞ্চিত হয়ে এরা হয়ে উঠেছে উন্মত্ত। সীমান্তের অপর পাড়ের মদদ পেয়ে ওরা মাঝে মধ্যেই বাংলাদেশের ভূখন্ডে চোরাগোপ্তা হামলা চালায়। নিরপরাধ মানুষের রক্তে লাল হয়ে যায় পার্বত্য চট্টগ্রামের শ্যামল নিসর্গ।

জনসমর্থনহীন কোন সন্ত্রাসী তৎপরতা কোনদিন কোন দেশেই দীর্ঘস্থায়ী হয়নি, হতে পারেও না। পার্বত্য চট্টগ্রামেও পারবে না। প্রশ্নটা শুধু সময়ের ব্যাপার মাত্র।

# পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা
# জাতীয় নেতৃবৃন্দের অভিমত

পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা সম্পর্কে জাতীয় নেতৃবৃন্দের মতামত বা দৃষ্টিভঙ্গী অত্যন্ত স্পষ্ট। তবুও বইয়ের সম্পূর্ণতার স্বার্থে এখানে তা সংক্ষিপ্ত আকারে সন্নিবেশিত করা হচ্ছে।

**দেশনেত্রী খালেদা জিয়া**

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া বলেছেন, কেবলমাত্র দেশের সংবিধান ও সাংবিধানিক কাঠামোর মাধ্যমেই পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার একটি রাজনৈতিক সমাধান খুঁজে বের করা সম্ভব।

প্রধানমন্ত্রী গত ১৩মে খাগড়াছড়ি স্থানীয় সরকার পরিষদ ভবন উদ্বোধন অনুষ্ঠানে ভাষণদানকালে এ কথা বলেন।

তিনি বলেন, সরকার সন্ত্রাসবাদ ও সন্ত্রাসীদের কাছে নতি স্বীকার করবে না। বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকার খোলা মন নিয়ে যে কোন সময় বিদ্যমান পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনায় প্রস্তুত। বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদী চেতনার ওপর গুরুত্বারোপ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন আমরা সকলেই বাংলাদেশী এবং সরকার দেশের সকল অঞ্চলের সুষম উন্নয়নে বিশ্বাসী।

দেশনেত্রী বলেন, বর্তমান বিএনপি সরকার পার্বত্য জেলাসমূহের স্থানীয় সরকার পরিষদগুলোকে ৭টিরও বেশী বিষয়ে দায়িত্ব হস্তান্তর করেছে এবং ভবিষ্যতে আরো করবে।

**শেখ হাসিনা**

জাতীয় সংসদে বিরোধী দলীয় নেত্রী সম্প্রতি খাগড়াছড়ির লোগং-এ সংঘটিত হত্যাকান্ডস্থল পরিদর্শন শেষে জেলা সদরে এক জনসভায় ভাষণ দেন।

তিনি বলেন, আমরা পাহাড়ী-বাঙালী কোন ভেদাভেদ চাই না। সকলেই খেয়ে পরে স্বস্তিতে বাঁচতেচাই।

**জাগপা প্রধান শফিউল আলম-এর অভিমত**

পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা-নির্ভেজাল আগ্রাসন এবং রাষ্ট্রীয় অখন্ডতা ও স্থিতিশীলতা বিনষ্টের সুপরিকল্পিত বিদেশী চক্রান্ত। ভারতের অন্ন, অর্থ ও অস্ত্রে সজ্জিত মুষ্টিমেয় ঘাতক শান্তিবাহিনীর নাশকতামূলক তৎপরতাকে রাজনৈতিক সমস্যা বলে চিহ্নিত করা যায় না। ভারতীয় আগ্রাসন ও চক্রান্ত মোকাবিলায় সরকারের সুস্পষ্ট নীতিমালা না থাকার কারণেই এ সমস্যা মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। লোগং ঘটনাকে কেন্দ্র করে যারা মানবাধিকার লংঘনের আওয়াজ তুলেছেন, শান্তিবাহিনীর পাইকারী হত্যাকান্ডের ব্যাপারে তারা নীরব কেন?

# THE CHT

## AN ANALYSIS ON THE PRESENT SITUATION

**BASIC FACTS ABOUT THE REGION**

**Configuration of land :** The Chittagong Hill Tracts is situated to the South-East of Bangladesh comprising 5,093 square miles which is about one tenth of the total area of the country. To the north western border is the Tripura state of India, to the East is Mizoram, Burma to the east and south, while district of Chittagong to the west. The region is featured by rugged hills, the highest peak being 3000 feet. In the north side of this hilly region there are major valleys of the Chengi, Maini and Kasalong flowing southward. Moreover, there are the narrow valleys of the Raikhaing, Sangu and Matamuhuri in the south. The famous Kaptai Lake spread over 350 square miles is located in the middle of the hilly region. Also there is the 1400 square miles reserve forest.

**Administrative :** In the past, entire Chittagong Hill Tracts Region formed only one districts. In 1983, the region was divided was into there districts namely Rangamati, Khargachari and Bandarban. These districts have 10,8 and 7 upazillas respectively. Traditionally the region is divided into three circles namely Mong, Chakma and Bomang headed by respective circle chiefs. The entire areas is divided into 359 mouzas. Head of a mouza is known as Headman while head of a para known as karbari.

**The People and the Population :** The tribals of Chittagong Hill Tracts are not original inhabitants of the region. During the period from 16 to 17 century, various tribes migrated to this area from northern area of present Mianmar (Burma) through Arakan. The total population of the region is about

7.9 lac including those of 13 tribes and the non-tribals. The 13 tribes are Chakama, Marma, Tripura, Murong, Tanchainga, Bom, Pankhu, Khum, Ushai, Khiang, Chak, Lushai and Riang. There are two types of non-tribals in Chittagong Hill Tracts. Forefathers of one type settled there in 17 country while the other setlled there during last decade. The tribals are quite separate from the non-tribals in respect of race and religion. The non-tribals (Bengalees) are mostly muslims while most of the tribals belong to Buddhism. There are some Hindus and Chritians also. Some small tribes are Animists. As traditional characteristics, the tribals prefer to live isolated life within the tribes. In general, all the tribes like dance and song.

**Economy :** Joom or shifting cultivation in the traditioal way of earnning bread by the inhabitants of this region. But at present that is limited among the small tribals only of late most of the tribals have taken to cultivation in the plain land like the non-tribals. A small number of Tribals are engaged in trade and commerce. Most of the traders are the chakmas. A good number of tribals are now serving in Government and private organizations. But most of them belong to chakma tribe.

**Education :** Before 60s, ratio, of literacy in Chittagong Hill Tracts was very insignificant. But ratio of literacy considerably increased where after the 60s and later after 171, the Government of Pakistan and the Government of Bangladesh set up a good number of eduicational institutions in the region. Till now, except the Chakmas, ratio of literacy among other tribe is very low. The Chakmas are very much advanced and ratio of literacy among them is about 52% i.e, more than the people of the plain area. Each tribe has own spoken language which is quite different from the other. But except the Marmas, other tribes have no alphabet. Written languages of all the tribes is Bengali.

## BACKGROUND OF INSURGENCY & ITS GRADUAL DEVELOPMENT

Insurgency among elthnic groups of people is now a common feature in modern world. It is generally prevalent among people living in peripheral regions which enable them get support from across border. Insurgency in Chittagong Hill Tracts is not, therefore, an isolated event. It is a part of insurgency prevalent among tribes of Mongolian origin in South-East Asia. Greater Chittagong Hill Tracts was a backward area for long since. Break off tendency or movement grew up in the area as a result of social discrepancy, economic neglect and solitical difference of opinion.

During the British occupation of the region, it was administered as a non-regulated district as per section of Chittagong Hill Tracts Regulation 1900. This Regulation did not provide any political right to the tribals though it banned settlement of outsiders in the area and also ensured preservation of social economic and cultural rights of the tribals.

Superintendent of 'Hill Tracts and later District Administrator was the all powerful authority. Circle chiefs used to collect taxes and discharge socio-cultural responsibilities under the districts administration. It was only after the emergency of Pakistan that they started enjoying political rights under the constitution. The Hill Tracts Mannual was amended to some extent during Pakistan time which affected the status of the region as an excluded area and opportunity was created for settlement of outsiders there. Though settlement of Bangalees in the area started before the Moghul period, it gained momeantum after the emergency of Pakistan. That resulted in conflict between the tribals and the non-tribals in respect of ownership of land. The installation of Kaptai Hydro Electric Project in 1962 caused inundation of 54000 acres of cultivable land mostly belonging to the Chakma Tribes and

that also rendered one lac people of Chakma circle landless. This is a major cause of 'their dissatisfaction.

Soon after the emergence of Bangladesh in 1971-72, M N Larma and some other leaders of the region raised the demand for provincial autonomy. The then Prime Minister Sheikh Mujibur Rahman refused to consider any such demand and as a result they formed an armed cadre named 'Shanti Bahini' as a preparation for armed struggle. The citizen of the country was termed as 'Bangalee' in the constitution of 1972 which infuriated the tribals very much as they considered it as an encrokchment on their ethinic right. After that they started their armed activities by ambushing a police patrol in the beginning of 1976.

Bangladesh Army was deployed in the region on and from 07 October 1976 to ensure security of the people and also to help the civil administration. Since then the Army has been there fighting the battle against the terrorists.

Insurgency took a vilent turn in 1979 when about one lac destitute tribals were settled in Chittagong Hill Tracts as a fresh move. At that time Shanti Bahini enjoyed full support from the tribals. Situation aggravated to an alarming extent during 1985-86 when Shanti Bahini conducted brutal attack on non-tribal habitations. As a result several hundred non-tribals including women, infants and aged people where killed and over one thousand injured. That caused a riot between tribals and non-tribals leading to exodus of about 30 thousand tribals to tripura State of India. In 1987, non-tribals were evacuated from their habitats and given shelter in cluster villages with a view to providing security in the backdrop of even-increasing attack of Shanti Bahini on the non-tribals. Since then all the non-tribals have been living in the cluster viliages depending on ration supplied by the government. They are living inhuman life and are deprived of normal economic activities. Situation is not yet favourable to send them back to their places of habitation because of insurgency and inability to provide security due to inadequate number of troops.

**Internationalization of the problem and malpropaganda carried on by the insurgents:** The Shanti Bahini has been using the tribal refugees staying in Tripura of India in its own interest. The insurgents have been trying to internationalize the problem of Chittagong Hill Tracts with the help of the refugees projecting the issue as a case of human rights violation. Taking advantage of this situation, they have been collecting a share of the relief, given to the refugees, of course with the tacit consent to Indian Intelligence Authority, besides recruiting people for their organization from among the refugees. As such are not at all interested to solve the refugee problem. On the contrary, they are rather trying to create new refugee problem through continuously look before of non-tribals. It needs mentioning here that their all such efforts are going in vain. But they succeeded in compelling about 15 thousand tribals to cross the border on the eve of Local Government Council Election in June, 1989 of them about 26000 refugees have already come back after the Local Government. Council elections number of returnees is on increase very day.

## GOVERNMENT STEPS TO SOLVE THE PROBLEM

Since the beginning of the problem the Government of Bangladesh took various constructive steps through the security forces and the administrative machinery. At the initial stage, those steps, however, were to some extend disorganized and piecemeal. Later, concerted and intergrated steps were taken in the light of proper indentification of the problems and practical experience steps taken are as follows in brief: Security forces were deployed in Chittagong Hill Tracts in October 1974 to help the Civil Administration in Maintaining Law and order and there by to normalize the situation. To achieve that goal, the Government placed all the paramilitary and Civil Armed Forces deployed in Chittagong Hill Tracts at the command of Army Division.

The Government constituted council committee on Chittagong Hill Tracts in 1977 for high level decision-making on the problem and to issue necessary directives. At present this committee in known as cabinet committee on Chittagong Hill Tracts.

In 1980 the coordination committee for CHTs was constituted with the GOC of the Army Division as the Chairman and other senior officers of Army, paramilitary and civil administration deployed in the region as members to conduct counter insurgency and coordinate security and development measures.

In order to ensure socio-economic development in the region, the Chittagong Hill Tracts Development Board was set up in 1976 at the behest of the then President. Since the inception of the Board and till June 1990, the Government spent a sum of about Tk.402 crore against various projects with a view to improving development infrastructure and better socio-economic condition of the people living there. It needs mentioning there that the tribals living in Chittagong Hill Tracts from only 45% of the total population of the country. But the amount spent for development of the area is many times more in comparison with amount spent for any other region of the country. For that reason the hill districts are more developed than many plain districts.

Age limit has been extended and academic qualification relaxed one step down the facilitated employment of tribals in government posts. In addition to 5% quota of services reserved for the tribals, as a special arrangement 1877 posts have been created for the tribals of Chittagong Hill Tracts. Because of this arrangement, a good number of unemployed tribal youths have already been employed in various organizations. The Chakmas, as a single tribe, have reaped the maximum benefit of employment.

To ensure development in the fields of education seats have been reserved for tribal students in higher educational

institutions, selection procedure for admission has been relaxed or made easy besides establishing schools and colleges here and there. It is only because of the relaxation that many tribal student getting second divison are now studying in Medical and Engineering Colleges whereas many Bangalee students are not getting chance to study there despite getting even star marks. As a result, ratio of literacy amouint the Chakmas now is 52% which is more than the overall ratio of the country. Non-tribals liring in the hill districts are not, however, lucky enough to get such chance. There litercy rate is only 17%.

Settlement of non-tribals in Chittagong Hill Tracts was totally stopped by the government in 1984. At present such settlement is possible only with the approval of the Local Government Councils.

Representatives of the Government held six meetings with Parbatta Chattagram Jana Sanghati Samity with a view to achieving a political settlement of the Hill Tracts problem. But it was not possible to findout any solution because of insistence of Jana Sanghati Samity for provincial and regional autonomy. It needs mentioning here that such demands can not be met without bringing basic amendments in the constitution. It will be unwise to do that in greater interest of the country.

In the backdrop of obduracy of Jana Sanghati Samity, the Government embarked upon lengthy discussion with the tribal leaders living in the hill districts of Bangladesh to findout a political solution of the problem of Chittagong Hill Tracts. On the basis of that a blue-print was prepared to solve the problem and to that effect an agreement was signed with the tribal leaders. The Hill District Local Government Council bill was passed in the light of that agreement, Local Government Election was held on 25 June, 1989 under the purview of that blue-print and the councils took over charge following oath taking on July 2. As per provision of the bill, only a tribal can be elected to the post of Chairman of the council with two third seats

reserved for the tribal members. The bill also provides for raising a sparate police force besides transfer of 22 subjects concerning socio economic development to the councils. A number of important subject including primary education, health & family planning and agriculture have already been transfered in the meantime. Since the very beginning, Shanti Bahini has been opposing the arrangement and all efforts including armed terrorism and adverse propaganda are being made to foil it. Recently an organization named Pahari Chatra Parishad has indulged in propaganda against the system. Indeed, local government council is a practical step aimed at meeting the demand of self-governence of the tribals Bangladesh Government delegations so far visited India a number of times to seek solution to refugee problem. But everytime the insurgents failed the attempt by their selected refugee leaders on various pretexts and imposing pre-conditions. Bangladesh made the last attempt in that regard on 18 February, 1991.

The Government announced general amnesty several times to encourage and facilitate return of 'the insurgents to nromal life. Taking advantage of general amnesty, a good number of insurgents have returned to nromal life.

**THE PRESENT SITUATION**

The following is an overall picture of situation now obtaning in Chittagong Hill Tracts:

The Government of Bangladesh have inded succeded in fulfilling most of the political and socio-economic helps and aspriations of the tribals through introduction of district local government council in the hill districts. Through this system the tribals have become a part of political and administrative structure of the region and in fact, they are now all in all in Chittagong Hill Tracts. Shanti Bahini lost credibility to multitude after introduction of that system because it could not deliver any worthwhile benefit to the tribals after seventeen years of armed struggle. The people have every doubt whether Shanti Bahini will be able to give

in future any things better than what has already been made available through this system. This has resulted in decrease in peoples support for Shanti Bahini on the one hand and on the other hand public opinion in favour of the new system and the Government is on gradual increase. Under present circumstances the insurgents are now required to face two fronts militarily the security fordces and politically the local government councils.

**SOME RECOMMENDATIONS**

About sending back the non-tribals living in cluster villages to their origional places of living: During 1977-78 in the backdrop of insurgents ever increasing massacre of Bangalees about two lac Banglaees (26,000 families) gathered from far-flung areas were tempararilly settled in cluster villages located near camps of security forces in Rangamati and Khagrachari districts. Since then they have been living there depending on weekly ration of 21 kg foodgrains suplied by the government. The are not allowed to move out of security belt in search for economic activities and that has been causing inhuman misery to these people. These Bangalees are demanding measures leading to their return to place of origin. But to do that the Government have to make security arrangement. It will be necessary to deploy 204 VDP (Village Depence party) platoons to ensure protection and that will entail an additonal yearly expenditure of Tk.12 croré. In another sense this will make a saving of Tk.15 erore a year because the Government is now required to spend Tk.27 erore per year for supplying ration to the cluster villages. Moreover when set free, these people will contribute to generation of economic activities in their respective place.

About rehabilitation of those returning from India and affected by Shanti Bahini: Tribals returning from India or affeared by Shanti Bahini have been rehabilitated near the camps of Security Forces for security reasons. These newly created rehabilitation Zones are known as Baragram and Santigram. The inhabitants of these rehabilitation Zopanes

are given weekly ration of 21 kg foodgrains and were initially given shelter for six months only. It was expected that by that time they would be in a position to findout alternative source of income. But that did not happen. These people are now leading must miserable life because the Government did not allot any foodgrain form them under rehabilitation scheme after September 1991. Under such circumstances, we have now only two alternatives. First alternative is to send them back to their places and subject to torture by Shanti Bahini. Second alternative is to continue supply of ration to the rehabilitated families till alternative sources of income can be created for them. The issue needs consideration and decision.

**CONCLUSIONS:**

Insurgency is a type of warfare which does not start all on a sudden rather it assumes momentum slowly. In the same way due to positive steps taken by the Government does not terminate all on a sudden, rather dies down gradually. Natural death of insurgency in Chittagong Hill Tracts is invitable of the Government continues to take up positive steps and security forces do not cease to exert pressure on the insurgents. But it is not possible to point out exact time limit when insurgency will cease to exist. It will depend on how quickly the local administration to the people. Till that time security forces have to assist the civil administration as they are doing now.

## POPULATION CHART

| TRIBES | KHAGRACHARI | DISTRICTS<br>RANGAMATI | BANDARBAN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| CHAKMA | 965905<br>32.17% | 141595<br>42.83% | 3426<br>2.09% | 241616<br>30.57% |
| MARMA | 46168<br>15.37% | 33668<br>10.24% | 51394<br>31.66% | 131230<br>16.60% |
| TRIPURA | 46442<br>15.46% | 5342<br>1.61% | 6671<br>4.09% | 58455<br>7.39% |
| MURONG | — | 176<br>.05% | 16992<br>10.42% | 17168<br>2.17% |
| TANGCHANGYA | — | 10661<br>3.23% | 5479<br>3.36% | 16140<br>2.04% |
| BOWM | — | 116<br>.03% | 5468<br>3.36% | 5584<br>0.71% |
| PANKHOO | — | 1668<br>.51% | — | 1668<br>0.21% |
| KHUMI | — | — | 1091<br>.63% | 1091<br>0.14% |
| MRO | — | — | 966<br>.58% | 966<br>0.12% |
| KHYANG | — | 827<br>.24% | 501<br>.29% | 1328<br>0.17% |
| CHAK | — | — | 798<br>.49% | 798<br>0.10% |
| LUSHAI | — | 653<br>.19% | 16<br>.009% | 669<br>0.08% |
| RIANG | 2034<br>.66% | 400<br>.12% | — | 2434<br>0.31% |
| TRIBAL | 191239<br>63.69% | 195106<br>59.48% | 92802<br>57.18% | 479147<br>60.62% |
| BENGALEE | 108979<br>36.30% | 132818<br>40.49% | 69470<br>42.76% | 311267<br>39.38% |
| GRAND TOTAL | 300218 | 327924 | 162272 | 790414 |

# MULTI SECTORAL DEVELOPMENT PROGRAMME
# AND
# COMPONENTWISE PROGRESS AT A GLANCE
# UPTO 1990-91

(TAKA IN LACS)

| SL No | Name of Component & Executing Agency | Period of Execution | Estimated cost | Expenditure | Physical Progress in % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Upland Settlement (CHTDB) | 1979-93 | 4769.30 | 3766.57 | 80% (Approx) |
| 2 | Afforestation & Settlement (Forest Deptt) | 1979-90 | 343.45 | 314.37 | 81% (") |
| 3. | Road Network (RHD) | 1980-91 | 6448.30 | 5973.92 | 85% (") |
| 4. | Agril Research (BARI) | 1979-87 | 357.96 | 361.22 | 98% (") |
| 5. | Agril Extension (DAE) | 1979-87 | 539.08 | 493.65 | 100% |
| 6. | Nurseries Dev (DAE) | 1979-85 | 77.73 | 77.73 | 100% |
| 7. | Storage Facilities (BADC) | 1981-86 | 192.17 | 177.78 | 100% |
| 8. | Cottage & Rural Industries (BSCIC) | 1979-85 | 288.62 | 242.25 | 100% |
| 9. | Health Facilities (Health Part) (DOH) | 1979-83 | 35.76 | 34.92 | 100% |
| 10. | Health Facilities (PC & FP Part) | 1979-85 | 22.82 | 19.58 | 100% |
| 11. | Strengthening of CHTDB (CHTDB) | 1979-88 | 690.99 | 690.99 | 100% |
| | Total | | 13766.38 | 12153.48 | |

## CHTDB (NORMAL)

Sector-wise Schemes Taken up and Completed with Expenditure Incurred
(From 1975-76 to 1990-91 upto Jun. 1991)

| S/ No. | Name of Sector | Schemes taken up | Schemes Completed | Amount spent (Tk in lac) |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Communication | 140 | 127 | 564.71 |
| 2. | Sports and Culture | 92 | 66 | 266.96 |
| 3. | Agriculture (including Livestock & Fisheries) | 101 | 92 | 619.86 |
| 4. | Construction (Building) | 41 | 35 | 321.01 |
| 5. | Education | 214 | 168 | 625.45 |
| 6. | Social Welfare | 277 | 217 | 689.95 |
| 7. | Cottage Industries | 28 | 28 | 44.91 |
| 8. | Reserve Fund | 01 | 01 | 2.15 |
| 9. | Management Expenditure | — | — | — |
| | Total | 894 | 734 | 3561.70 |
| * | Current year ADP is | 280.00 Lacs | | |

# RANGAMATI ZILLA LOCAL GOVERNMENT PARISHAD

1. **Composition**

| | | | |
|---|---|---|---|
| a. | Chairman | – | 1 |
| b. | **Members** | | |
| | (1) Tribal | – | 20 |
| | (2) Non-Tribal | – | 10 |

2. **Distribution of Tribal Seats**

| | | | |
|---|---|---|---|
| a. | Chakma | – | 10 |
| b. | Marma | – | 4 |
| c. | Tangchangya | – | 2 |
| d. | Tripura | – | 1 |
| e. | Lushai | – | 1 |
| f. | Pankho | – | 1 |
| g. | Khyang | – | 1 |

## KHAGRACHARI ZILLA LOCAL GOVERNMENT PARISHAD

1. **Composition**

| | | | |
|---|---|---|---|
| a. | Chairman | – | 1 |
| b. | **Members** | | |
| | (1) Tribal | – | 21 |
| | (2) Non-Tribal | – | 9 |

2. **Distribution of Tribal Seats**

| | | | |
|---|---|---|---|
| a. | Chakma | – | 9 |
| b. | Tripura | – | 6 |
| c. | Marma | – | 6 |

## BANDARBAN ZILLA LOCAL GOVERNMENT PARISHAD

1. **Composition**

| | | | |
|---|---|---|---|
| a. | Chairman | – | 1 |
| b. | **Members** | | |
| | (1) Tribal | – | 19 |
| | (2) Non-Tribal | – | 11 |

2. **Distribution of Tribal Seats**

| | | | |
|---|---|---|---|
| a. | Marma and Khyang | – | 10 |
| b. | Murang | – | 3 |
| c. | Tripura and Usai | – | 1 |
| d. | Tangchangya | – | 1 |
| e. | Bowm, Lushai and Pankho | – | 1 |
| f. | Chakma | – | 1 |
| g. | Khumai | – | 1 |
| h. | Chak | – | 1 |

| Period | Cause | No |
|---|---|---|
| Oct 1985<br>to<br>Dec 1986 | Riot between tribals and non-tribals | 30,000 |
| May 1989<br>to<br>June 1989 | Insurgents forced tribals to cross over to India so that they can not take part in the District Local Government Council Election | 15,000 |

## RETURN OF REFUGEES

| Tribe | No of Families | No of Members |
|---|---|---|
| Chakma | 5894 | 19416 |
| Marma | 1212 | 2926 |
| Tripura | 1977 | 5998 |
| Total | 9083 | 28,340 |

Information Minister Barrister Nazmul Huda seen addressing the participants of 'Long March' in front of National Press Club. Dhaka on 26 Feb. '92. The Long march from Chittagong Hill Tracts to Dhaka spontaneously participated by tribals-non-tribals alike was guided by National Co-ordination and Peace Council in protest against brutality by so-called Shantibahini. The gathering was also addressed by Home Minister Abdul Matin Chowdhury.

*Bodies of innocent non-tribal workers brutally killed by so called Shanti Bahini at Khagrabill, Ramgarh. The unfortunate men are now free from all anxiety. But who will earn bred for their children and wives.*

**কাপ্তাইর দেবতাছড়ির নগেন্দ্র তংচংগা ১৯৯১ সালের ১৯ ফেব্রুয়ারী শান্তিবাহিনীর গুলিতে প্রাণহারায়**

খাগড়াছড়ির পানছড়িতে সন্ত্রাসবাদীদের গুলীতে নিহত ৩ জন বাংলা ভাষাভাষী

রাঙ্গামাটির ভূষণছড়ায় সন্ত্রাসবাদী দল গুলী ও অগ্নিসংযোগ করে মাতা ও শিশুকে নির্মমভাবে হত্যা করার দৃশ্য

*"My soul is sick with everyday's report of wrong and outrage with which earth is filled". English poet William Cowper's (1731-1800) soul would have been more sick to see this atrocity of so-called Shanti Bahini in Chittagong Hill Tracts. The Charred body, the dwellings burnt to ashes confront us with a big interrogation-what was the fault of this man?*

শান্তিবাহিনী আগুনে পুড়িয়ে নৃশংসভাবে হত্যা করেছে একটি বাঙালী মুসলমান পরিবার

*পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা সম্পর্কে জাতীয় নেতৃবৃন্দের মতামত বা দৃষ্টিভঙ্গী অত্যন্ত স্পষ্ট। তবুও বইয়ের সম্পূর্ণতার স্বার্থে এখানে তা সংক্ষিপ্ত আকারে সন্নিবেশিত করা হচ্ছে।*

*গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া বলেছেন, কেবলমাত্র দেশের সংবিধান ও সাংবিধানিক কাঠামোর মাধ্যমেই পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার একটি রাজনৈতিক সমাধান খুঁজে বের করা সম্ভব।*

**প্রধানমন্ত্রী দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া**

*জাতীয় সংসদে বিরোধী দলীয় নেত্রী বলেছেন, আমরা পাহাড়ী-বাঙালী কোন ভেদাভেদ চাই না। সকলেই খেয়ে পরে স্বস্তিতে বাঁচতে চাই।*

**বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা**

*পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা–নির্ভেজাল আগ্রাসন এবং রাষ্ট্রীয় অখন্ডতা ও স্থিতিশীলতা বিনষ্টের সুপরিকল্পিত বিদেশী চক্রান্ত। ভারতের অন্ন, অর্থ ও অস্ত্রে সজ্জিত মুষ্টিমেয় ঘাতক শান্তিবাহিনীর নাশকতামূলক তৎপরতাকে রাজনৈতিক সমস্যা বলে চিহ্নিত করা যায় না। ভারতীয় আগ্রাসন ও চক্রান্ত মোকাবিলায় সরকারের সুস্পষ্ট নীতিমালা না থাকার কারণেই এ সমস্যা মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। লোগং ঘটনাকে কেন্দ্র করে যারা মানবাধিকার লংঘনের আওয়াজ তুলেছেন, শান্তিবাহিনীর পাইকারী হত্যাকান্ডের ব্যাপারে তারা নীরব কেন?*

**জাগপা প্রধান শফিউল আলম**